নারীর রূপ

শ্রীহরিপদ গুহ

বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৩৪১
মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১০।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

স্বর্গগতা

মাতৃদেবীর শ্রীচরণ

উদ্দেশে—

—হরিপদ—

—নারীর হৃদয়খানি বিমল দর্পণ,
তারি ছায়া ভাসে প্রাণে যে থাকে সম্মুখে,
একটু সরিলে দূরে নাহি কাঁদে মন,
আরেক নূতন ছায়া পড়ে তার বুকে

*　　　　*　　　　*

রমণী জীবনে ধর্ম্ম নাহি এককণা
পাপিষ্ঠা নারীর প্রেম মহপ্রতারণা !—

—গোবিন্দ দাস

নারীর রূপ

—এক—

জীবন-নাট্যের যে অঙ্কে একদিন যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, জানি না, আজ আবার সহসা তাহা তুলিতে হইল কেন? বিধাতার কি নিদারুণ পরিহাস!

মামার কোন সন্তান ছিল না। মামীমা আমাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষেই স্নেহ করিতেন।

মা-বাবা মনে মনে হয় তো আশার কত রঙীন জালই বুনিতেছিলেন; তাহা না হইলে আমাকে এমন করিয়া মামার বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিবেন কেন?

মামা জমীদার।

একটী সন্তান লাভের জন্য তিনি যত্নের কোন ত্রুটিই করেন নাই; যে যাহা বলিয়াছে, তিনি তাহাই করিয়াছেন। মাদুলীতে মামীর সমস্ত অঙ্গ ঢাকিয়া গিয়াছিল।

তাঁহারা একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মামা সর্ব্বদা বিমর্ষমুখে থাকিতেন; মামীমা মার কাছে দুঃখ করিতেন,—কাঁদিতেন।

তারপরই একদিন নিভৃতে মা আর বাবায় কি সব পরামর্শ হইল, আর তাহারই কয়েকদিন পরে আমি মাতুলালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

*　　　*　　　*

এখানে আসিয়া আমি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। মস্ত বড় বাড়ী! বহুলোকের কলরবে সর্ব্বদা গম্ গম্ করিতেছে। তাহার উপর মামা-মামীর অতি মাত্রায় স্নেহ আমাকে একেবারে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

স্বয়ং মামা-মামী স্নেহ করায় দাস-দাসী, সরকার-গোমস্তা সকলেরই অতিরিক্ত যত্ন ও আদরে আমি অতিশয় উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। নানা প্রকারে তাহারা আমার মনোরঞ্জন করিয়া আমাকে খুসী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমার জন্য আলাদা একটী দাসী এবং চাকর নিযুক্ত হইল। দাসী সুখদা আমার সমস্ত কাজ করিয়া দিয়া সকল বিষয়ে তদারক করিত। কখন্ কোন্ জিনিষটার প্রয়োজন হইবে, তাহা সে ঠিক্ করিয়া রাখিত; আর আমার বাহিরের কাজের জন্য ছিল নিতাই। সে আমাকে স্কুলে দিয়া আসিত, ছুটির পর আবার লইয়া আসিত, 'টিফিনে'র সময় আমার জলখাবার দিয়া আসিত, বিকালে মাঠে কিংবা নদীর ধারে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইত। ইহা ছাড়া যখন যাহা ফরমাস করিতাম, সে তাহাই করিত।

খুব আনন্দেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল।

মামীমা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করিতে চাহিতেন না ; মামা তাঁহার রকম দেখিয়া খুব হাসিতেন।

আমি কিন্তু লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতাম।

স্কুলে আমার পড়া-শোনা খুব ভালই হইতেছিল ; শিক্ষকেরা অনেকেই মামার নিকট আমার খুব প্রশংসা করিতেন। মামা হাসিতেন ; বলিতেন—'হ'বে না, ভাগ্নে কার ?'

—দুই—

পূজার আর কয়েকদিন মাত্র দেরী আছে। আনন্দময়ীর আগমনে আকাশে বাতাসে এক নব-পুলক-শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে।

মামীমার এক দূর সম্পর্কীয়া বৌদি' তাঁহার পুত্র শচীনকে লইয়া এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। আমার এত আদর-যত্ন দেখিয়া তিনি একেবারে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। শচীনকে সর্ব্বদা মামীমার কাছে থাকিতে বলিয়া দিলেন; নিজে যখন তখন মামীমার কাছে তাঁহার একটী সন্তান না হওয়ার জন্য দুঃখ করিতেন। তারপর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বেশ মিষ্ট করিয়া বলিতেন :—শত হইলেও শচীন তাঁহার আপনার জন। ইচ্ছা করিলে তাহাকে তিনি একেবারে দিয়া দিতে পারেন। এমনই আরও কত কি!

মামীমা কিন্তু কোনই উত্তর দিতেন না।

শচীন প্রায় সকল সময়ই মামীমার পিছন-পিছন ঘুরিয়া তাঁহাকে 'পিসি' 'পিসি' বলিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তুলিত!

প্রথম প্রথম মামীমা বেশ একটু বিরক্ত হইতেন। মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার চোখে-মুখে কিন্তু বিরক্তির ছাপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

শচীনকে আমার সমবয়সী সাথী পাইয়া প্রথমটায় তাহার সঙ্গে

আমি গঙ্গা-যমুনার মতই মিশিয়া গিয়াছিলাম। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সঙ্গ-সুখ ছাড়িতে চাহিতাম না। আমার খাবারের অর্দ্ধেক তাহাকে না দিয়া খাইতে পারিতাম না, ভাল ভাল খেলনাগুলি সব বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে খুসী করিতে চেষ্টা করিতাম।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু শচীনের উপর মামীমার বেশ একটু স্নেহ পড়িয়া গেল। আমার খাবার হইতে অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া তিনি শচীনকে দিতে লাগিলেন; প্রথম দুই-একদিন বেশ উপেক্ষার চোখেই দেখিয়াছিলাম; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিলাম না। আমার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আমার একাধিপত্যময় স্নেহের সাম্রাজ্যে যে একজন অংশীদার জুটিবে ইহা নিতান্তই অসহ্য।

আমি সর্ব্বদা মুখ-ভার করিয়া থাকিতাম; একরকম মামীমার কাছে যাইতাম না, সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম।

মামীমা কিন্তু চট্ করিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে বারান্দায় একা পাইয়া ধীরে ধীরে কাছে গিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া মিষ্টকণ্ঠে কহিলেন 'রাগ করিস্ নি মণি, দু'দিন বাদেই তো শচীন চলে যাবে,—ছিঃ ওকে হিংসে করিস্ নি!'

তাঁহার স্নেহ-শীতল স্পর্শে আমি কিন্তু ঠিক্ থাকিতে পারিলাম না। ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। 'পাগল ছেলের রকম দেখ' বলিয়া তিনি সযত্নে তাঁহার অঞ্চল দিয়া আমার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া স্নেহ-ধারায় একেবারে সিক্ত করিয়া ফেলিলেন।

ঠিক্ সেই সময়ে মামীমার 'বৌদি' সেখানে উপস্থিত হইয়া

বলিলেন—'এই যে, তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, একা একা ভাল লাগ্‌ছিল না; ভাবলুম যাই, তোমার সঙ্গে বসে দু'টো কথা কই গে!' পরে আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'ও বাবা! বুড়ো ছেলের রকম দেখে আর বাঁচি না, মেয়েছেলের মতো ফুঁপিয়ে কান্না। আর তুমি তাকে সোহাগ করছ, ধন্যি তুমি! আমি হ'লে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়তুম; কান্না বের ক'রে দিতুম!"

নিমিষে মামীমার চোখমুখ একেবারে লাল হইয়া গেল, তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'তুমি হ'লে কি করতে তা' আমি জানতে চাই না। বিরক্ত করো না, যাও—নীচে যাও।' বলিয়া তিনি আর একমুহূর্ত্তও সেখানে দাড়াইলেন না; আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন।

'তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি'—বলিয়া গজ্‌ গজ করিতে করিতে শচীনের মা নীচে নামিয়া গেলেন।

—তিন—

ষষ্ঠীর প্রভাত।

সানাই মধুর সুরে প্রভাতী গাহিতেছিল; ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল নূতন কাপড়-জামা পরিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

মামাবাবু আমাকে অনেকগুলি পোষাক দিয়াছিলেন; শচীনকেও দিয়াছিলেন; তবে তার পোষাক অপেক্ষা আমারগুলি খুব ভাল এবং সেগুলির দামও অনেক বেশী। আমার একটা জামা দেখিয়া শচীনের বড় লোভ হইল; সে বায়না ধরিয়া বসিল, তাহার ঐটা চাই। মামাবাবু মহা লজ্জায় পড়িয়া গেলেন; বলিলেন—'এক্ষুনি কোথায় আর পাই? তোকে পরে একটা তৈরী করিয়ে দেব'খন।'

ভবি কিন্তু তাহাতে ভুলিল না।

সে নাকী সুরে বলিতে লাগিল—'না, আমার ঐটে চাই।' মামাবাবু তাহাকে যতই বোঝান, সে ততই বলে-'না, আমার ঐটে চাই।' তখন তিনি তাহাকে এমন এক ধমক দিলেন যে, সে ভয়ে জড়সড় হইয়া একেবারে চুপ। তারপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

আমিও খুব ভীত হইয়াছিলাম। আস্তে আস্তে বলিলাম—'আমার জামাটা শচীনকে দিয়ে দেব?'

মামাবাবু একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, 'না রে পাগল; দরজীকে বলে আজই একটা করিয়ে দিচ্ছি। ওটা তুই গায়ে দে।'

তারপর কি একটা প্রয়োজনে তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন; আমিও বাড়ীর ভিতরে গেলাম।

সেখানে এক তুমুল কাণ্ড।

শচীনের মাতা তাহাকে একচোট প্রহার করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—'পাজী ছেলে, তোমার মুখ একেবারে ভেঙ্গে দেব, আমায় চেন না তুমি? মণি আর তুমি সমান নাকি? গরীবের বাছা, গরীবের মত থাক্‌বে, তোমার অত আধিক্যেতা কেন? তোমায় তো আর পুষ্যি দিই নি, অত বায়না কিসের? আর কার কাছেই বা?' বলিয়া তিনি গজ্ গজ্ করিতেছেন।

মামীমা রাগে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিলেন; এমন রাগ তাঁহার আর কখন দেখি নাই। তিনি গম্ভীর স্বরে শুধু ডাকিলেন—'বউ'।

শচীনের মাতা একটু থতমত খাইয়া গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই বলিতে লাগিলেন—'হ্যা, সত্যি কথা বল্‌তে আমি ভয় পাই নে। ওতে আর মণিতে সমান না কি? তবে ওর অত বায়নাক্কা কিসের? আমার কি চোখ নেই? আমি কি কিছুই দেখি না? না, বুঝি না?'

মামীমা আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

* * * *

পূজার দালানে সব ছেলে মেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতেছিল;

আমিও সেখানে ছিলাম। দালানের এক পাশে একটা বালতীতে রঙ গোলা ছিল; (সবে মাত্র বাড়ীতে রঙ দেওয়া হইয়াছে) অকস্মাৎ শচীন কোথা হইতে আসিয়া বালতী হইতে রঙ লইয়া আচমকা আমার সেই নূতন জামাটায় মাখাইয়া দিল! এমন সুন্দর জামাটা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমার মনে বড় কষ্ট হইল; রাগ সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে ধরিয়া বেদম প্রহার দিলাম। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি হাসিতে লাগিল।

শচীন কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

একটু পরেই আমার তলব আসিল; মামীমা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। ব্যাপারটা মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইলাম।

বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখি—সেখানে কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হইয়াছে। শচীনের মাতা কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ী মাৎ করিয়া তুলিয়াছেন, আমাকে গালি-গালাজও দিতেছেন যথেষ্ট! আমাকে দু'ঘা মারিলে হয় তো মামীমা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন; কিন্তু শাপমন্যি তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। রাগে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিলেন; অত রাগেও আমার চেহারা দেখিয়া তিনি না হাসিয়া পারিলেন না: কিন্তু মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত করিয়া আগাইয়া আসিয়া আমার কান ধরিয়া টানিয়া নিলেন, এবং নিকটে একখানা বাখারী পড়িয়াছিল, সেখানি তুলিয়া লইয়া সপাং সপাং শব্দে আমার পিঠে ও মাথায় মারিতে লাগিলেন; আমি মাটীতে লুটাপুটী খাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মামীমার কিন্তু প্রহারের বিরাম ছিল না; মারিতে মারিতে শেষে নিজেই হাঁপাইতেছিলেন।

নারীর রূপ

দাসী সুখদা কোথা হইতে 'হাঁ-হাঁ' শব্দে ছুটিয়া আসিল। তারপর সে শচীনের মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—'হ্যা বৌ-ঠান, তুমি কেমন মানুষ গা? ছেলের মা হয়ে দাঁড়িয়ে এই মারটা দেখ্‌ছ? একটু কি মায়া-দয়াও নেই? ধন্যি মানুষ বাছা!'

শচীনের মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—'বৌ-ঠান কি করবে? তোমার মা-ঠাক্‌রুণ তাঁর শরীরের তেজ মেটাচ্ছেন!'

মামীমা তখনও কাঁপিতেছিলেন; কট্‌মট্‌ করিয়া একবার শচীনের মার দিকে চাহিয়া 'সুখী, কথা কস্‌নি, চলে আয়।' বলিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

সুখদা আমাকে কোলে করিয়া আমার ঘরে নিয়া কাপড়-জামা খুলিয়া ফেলিল। সে আমাকে সত্যই খুব ভালবাসিত; পিঠের আঘাতগুলি লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল; কপালে ও গালে কাল-শিরা পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া তাহার অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; আমি তখনও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া, ধীরে ধীরে আঘাতগুলির উপরে তেল মাখাইয়া দিতে লাগিল; ঠিক্ সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন মামাবাবু।

আমি যে শুধু যন্ত্রণায়ই কাঁদিতেছিলাম ঠিক্ তাহা নহে। জীবনে আমার ভাগ্যে এই সর্ব্বপ্রথম প্রহার! অদ্যাবধি আমি কোথাও মার খাই নাই। মামাবাবুকে দেখিয়া আমার কান্নার সুর আরও বাড়িয়া গেল।

মামাবাবু আমার আঘাতগুলি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে একেবারে গম্ভীর হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

—চার—

মামীমা তাঁহার ঘরে ব্যাজার হইয়া বসিয়াছিলেন।

বৎসরকারদিনে যে এমন একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবে, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। শুধু রাগের বশেই আমাকে এমন করিয়া মারিয়াছেন। এখন অনুশোচনায় একেবারে মরিয়া যাইতেছিলেন' তিনি আমাকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন; এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে মারায় অন্তর-বেদনায় তিনি একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলেন। নীরব-অশ্রুধারায় বসনাঞ্চল সিক্ত করিয়া ফেলিতেছিলেন।

মামাবাবু কখন যে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, মামীমা তাহা টেরই পান নাই, তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা মামাবাবুকে, বিশেষ করিয়া তাঁহার ক্রোধ-গম্ভীর-মুখ দেখিয়া তিনি একেবারে শঙ্কিতা হইয়া পড়িলেন।

মামাবাবুও যতটা রাগ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, মামীমার অবস্থা দেখিয়া ততটা রাগ রাখিতে পারিলেন না।

তিনি গম্ভীর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি মণিকে মেরেছ কেন?'

মামীমা নিরুত্তর।

মামাবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন।

এবার মামীমা তাঁহার মুখের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া তাড়াতাড়ি

দৃষ্টি নামাইয়া লইলেন। অশ্রু বাধা মানিল না, টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

মামাবাবু বলিলেন-'বেশ, ও যদি এখন তোমার আপদ-বালাই হ'য়ে থাকে, তুমি তোমার ভাইপো'কেই নিয়ে থাক ; আজই আমি মণিকে এখান থেকে তাড়াচ্ছি!' বলিয়া তিনি হন্‌হন্ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

মামীমা শিহরিয়া উঠিলেন। মামাবাবুকে তিনি খুব ভাল করিয়াই চিনিতেন ; তিনি জানেন যে, 'হাকিম নড়িবে, তবু হুকুম নড়িবে না।' রাগের মাথায় তিনি বছরকার দিনে আমাকে এমন নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া যে ভাল করেন নাই, তাহা তিনি অন্তরের সহিতই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং অন্তর-বেদনায় নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন ; তাহার উপর মামাবাবুর এইরূপ মন্তব্যে তিনি একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলেন। প্রথম তো খানিকক্ষণ মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিলেন ; তাহাতেও যখন কোন সান্ত্বনা পাইলেন না, তখন তিনি ধীরে ধীরে আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। সুখদা আমার মাথার কাছে বসিয়া পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছিল। মামীমাকে দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আচ্ছা, মা-ঠাকরুণ! এমন করে 'কি মারতে হয়? দেখ দেখিন্ দাগগুলো!' বলিয়া সে আঙ্গুল দিয়া আমার পিটের কাল-শিরাগুলো দেখাইয়া দিল।

মামীমা একেবারে কাঠ্ হইয়া গেলেন। এমন করিয়া যে মারিয়াছেন তাহা তিনিও বুঝিতে পারেন নাই। আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া তিনি

সুখদাকে বলিলেন—'তুই এখন যা' বাইরের কাজ-কর্ম্ম দেখ গিয়ে ; আমি এখানে বস্‌ছি !'

সুখদা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল ।

মামীমা আমার শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে আমার মাথায় ও দেহে হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন। তাঁহার স্নেহ-শীতল স্পর্শে আমার সারা দেহ পুলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল ।

একটু পরেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ মেলিয়া মামীমাকে দেখিয়া আমি পাশ ফিরিয়া খাটের শেষ প্রান্তে সরিয়া গেলাম। মামীমাকে এত নিকটে পাইয়া খুবই আনন্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু মনের অভিমান তখন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে ।

মামীমা আমার কাছে সরিয়া আসিয়া চুম্বনে চুম্বনে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ; আমি কোন বাধা দিলাম না। তারপর মামীমা আমার আঘাতগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'রাগ করো না মণি, শচীনদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে, রাগের মাথায় তোমাকে এমন ক'রে মেরেছি। এত যে লাগ্‌বে, তা' আমি বুঝ্‌তে পারি নি। আমার কি এখন কম কষ্ট হচ্ছে ! বলো, আমার ওপর রাগ করো নি !'

আমি নিরুত্তর

মামীমা আবার বলিতে লাগিলেন—'লক্ষ্মী, সোনা আমার বলো রাগ করো নি ! তোমার মামাবাবু আমার ওপর কত রাগ করেছেন ; আজই তোমাকে তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ; তুমি চলে গেলে আমি কা'কে নিয়ে থাক্‌ব ! লক্ষ্মী বাবা আমার, তুমি আমায় ফেলে যেয়ো না।'

মামীমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া আমার অন্তর বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল ; তথাপি আমি কিন্তু মামীমাকে আঘাত করিবার এতবড় সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না। বলিলাম—'কেন, শচীন তো থাক্‌বে, তুমি তাকে নিয়ে থেকো !'

মামীমা ছলছল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'তুইও শেষকালে আমাকে এম্‌নি ক'রে বল্‌তে আরম্ভ করলি ? বল্ !' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আমার মনের ভিতরকার মনটা কেমন করিয়া উঠিল। আমি হাত দিয়া মামীমার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম—'আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না মামীমা !'

মামীমার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আমার মস্তকে স-স্নেহে একটা চুম্বন দিয়া বলিলেন—'বেঁচে থাক' বাবা !'

ঠিক সেই সময়ে মামাবাবু আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আমাদের এই অবস্থায় দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। মামাবাবু মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলেন, আমাদের এমন মিলন দেখিয়া তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না !

মামীমা মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন।

মামাবাবু সুখদাকে ডাকিয়া বলিলেন—'যা, নায়েবমশাইকে বল্ গিয়ে—পাল্‌কী-বেহারা বিদায় ক'রে দিক্। যাওয়া হ'বে না।'

মামীমা সুখদাকে ডাকিয়া বলিলেন—'হ্যা সুখী, তুই নায়েব-মশাইকে বলে' দিস্—দ্বাদশীর দিন যেন ওদের আস্‌তে বলে দেয়।'

বিস্ফারিত-নেত্রে মামাবাবু প্রশ্ন করিলেন—'কে যাবে ?'

মামীমা বলিলেন—'শচীন ও তার মা।'

মামাবাবু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—'হঠাৎ ?'

মামীমা বলিলেন—'হ্যা, ওদের জন্যই মণি আমার পর হ'য়ে যাচ্ছিল।'

মামাবাবু হাসিলেন। তারপর পকেট হইতে একটা জামা বাহির করিয়া কহিলেন—'যা মণি, শচীনকে এটা দিয়ে আয় !'

আমার আনন্দ আর ধরে না। তখনই ছুটিয়া শচীনকে জামা দিয়া আসিলাম।

শচীনের মা বলিল—'সুখদাকে তোর জামাটা কেচে দিতে বল্, ও-বেলাই শুকিয়ে যাবে'খন।'

আমি বলিলাম—'ও আর আমার চাইনে।'

—পাঁচ—

আজ দ্বাদশী।

শচীনদের যাইবার দিন।

মামীমা তাহাদের জন্য মিষ্টি ও নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের কয়েকটা পুঁটুলি বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

শচীন আমার সমবয়সী বলিয়াই হউক, কিংবা এতদিন একত্র ছিলাম বলিয়াই হউক, তাহার প্রতি আমার কেমন একটা টান পড়িয়া গিয়াছিল; তাহাকে আমি অন্তর দিয়াই ভালবাসিয়াছিলাম। আজ আসন্নবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় মনটা কেমন বেদনাতুর হইয়া পড়িল। আমার যাহা কিছু প্রিয় খেলনা এবং ছবির বই ছিল, সেই সমস্ত তাহাকে উজাড় করিয়া দিলাম।

গর্ব্বে এবং আনন্দে শচীনের বুক কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে স্নিগ্ধকণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিলাম, 'গিয়ে আমার কাছে চিঠি দিস্ ভাই!"

সে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, 'বয়ে গেছে।'

মুহূর্ত্তে আমার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। অন্তরের দানবটা লাফাইয়া উঠিতেছিল, তাহাকে দমন করিয়া সহজকণ্ঠে বলিলাম,—'আমার জন্য তোর মন কেমন করবে না?'

সে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ—দেখাইয়া বলিল 'এইটে।'

আমার অন্তর ছাপাইয়া কান্না আসিল; আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, ছুটিয়া আমার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। মনে হইল এক মুহূর্ত্তে আমি স্বর্গচ্যুত হইয়া একেবারে মাটীতে আসিয়া পড়িলাম। দারুণ ঘৃণায় আমার সমস্ত শরীর রি-রি করিতে লাগিল।

* * * *

শচীনের মায়ের কিন্তু যাইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। বেহারারা আসিয়া একবার জানাইয়া গিয়াছে যে, পাল্কী প্রস্তুত।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল; যাইতেও হইবে অনেকটা পথ। মামীমা বলিলেন—'বউ, অনেকটা রাস্তা, যেতে যে তোমাদের রাত হ'য়ে যাবে।

—একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নাও।'

শচীনের মা বিমর্ষমুখে বলিল—'আমার তো হ'য়েই গেছে; বাঁদরটা কোথায় গেল? এখন ও এলেই হয়।'

শচীনের খোঁজ পড়িয়া গেল। নিতাই বাড়ীর সর্ব্বত্র এবং আশে-পাশে যেখানে থাকা সম্ভব হইতে পারে সব দেখিয়া আসিল; কিন্তু কোথায় শচীন? তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অস্তগামী সূর্য্যের শেষ কিরণ-ছটা তরুর শিরে পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল।

মামাবাবু বেহারাদের চলিয়া যাইতে বলিয়া মামীমাকে আসিয়া বলিলেন—'বেহারাদের বিদায় ক'রে এলুম। আজ যখন ওদের যাওয়া হ'ল না, আর কিছুদিন থেকে যাক্ না? পরে একটা ভাল দিন দেখে গেলেই চল্‌বে।'

মামীমার মুখখানা নিমিষে গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি মনে মনে সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'বেশ, যাবার যখন ইচ্ছে নেই, আপাততঃ থাক্ তবে।'

তাঁহার বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মামাবাবু 'হো—হো' শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'এখানে থাক্‌বার আর কোন আপত্তিই নেই, শুধু অশান্তি সৃষ্টি না হ'লেই হ'ল! ওদের যাবার কথা তুমি আর কিছু বলো না; ওদের খুসী মত যখন হোক্ ওরা যাবে।'

মামীমা মাথা নাড়িয়া তাহাতে রাজী হইলেন।

শচীনদের না যাওয়াটা আমার কাছে কিন্তু 'শাপে বরের' মতই হইয়াছিল। বাড়ীতে আমার সমবয়সী আর কোন খেলার সাথী না থাকায়, আমি মনে মনে খুবই উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

—ছয়—

একটু বেশী রাতেই শচীন বাড়ী ফিরিল।

তাহার হাতে খানকয়েক মোটা মোটা আক্। আনন্দের আতিশয্যে সে আমাকে একখানা দিয়া ফেলিল। তাহার এই অযাচিত দানে আমার অন্তরটাও খুসীতে ভরিয়া গেল; প্রশ্ন করিলাম—'এত' রাত হ'ল কেন রে? কোথায় গিয়েছিলি?'

শচীন অধর কোণে হাসির রেখা টানিয়া বলিল—'ভারি মজা রে মণি' নদীর বাঁকে বসে' জেলেদের মাছ ধরা দেখ্‌ছিলুম, কত মাছ রে বাপ্! তারপর রতন জেলের সঙ্গে তার নৌকোয় ক'রে চড়ায় গেলুম, সেখান থেকেই তো এই আক্‌গুলো আন্‌লুম। কতরকম পাখী, সেখানে যাবি একদিন আমার সঙ্গে?'

নৌকায় চড়িয়া যাইতে মনে মনে আমার খুবই ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু, মামাবাবুর ভয়ে ব্যাজার হইয়া বলিলাম—'না, থাক্ গে।'

আমাদের কথা শেষ না হইতেই, তাহার মা আসিয়া। সেখানে উপস্থিত হইল।

কোন প্রশ্ন না করিয়াই তাহার মা তাহাকে তিক্তকণ্ঠে গালাগালি আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার চীৎকারের মাত্রাটা ক্রমেই চড়িয়া যাইতেছিল।

শচীন প্রথমে মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল, কিন্তু রাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ক্রোধ বাড়িয়া উঠিতেছিল।

শচীনের মা চীৎকার করিয়া বলিল—'মুখপোড়া বাঁদর, এতক্ষণ কোন্ চুলোয় ছিলে? জান না, আজ বাড়ী যেতে হ'বে? দেব, মুখের ভিতর নুড়ো জ্বেলে—,

বাধা দিয়া শচীন বলিল—'দেখ' মা, ভাল হচ্ছে না, এবার কিন্তু সব বলে দেব।'

মা হুঙ্কার দিয়া উঠিল। বলিল, "কি বল্‌বি রে পাজী, বল্ না দেখি? ঝেঁটিয়ে বিষ দাঁত ভেঙ্গে দেব না?'

শচীনও দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল,—"কি বলেছিলে তখন, মনে নেই? তুই যা' না কোথাও, রাত্ ক'রে ফিরিস্, আজ আমাদের গিয়ে কাজ নেই! আর দু'চারদিন বাদে গেলেই চল্‌বে। এখন কিছু জানেন না, নেকা সাজছেন।

'তোকে বলেছি এ কথা? মিথ্যেবাদী, মুখ একেবারে থেঁত্‌লে দেব না।' বলিয়া সে তাহার দিকে আগাইয়া গেল।

মামীমা মাঝে পড়িয়া তাহাকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—'কেন মিছেমিছি গোল কর্‌ছ বউ? পরের কাছে তো আর নেই, আজ যাওয়া নাই বা হ'ল।'

সে আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

মামাবাবু ঘরের ভিতরেই ছিলেন, কথাটা শুনিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—সাত—

কয়েক বছর পরের কথা।

ইতিমধ্যে শচীনরা কিছুদিনের জন্য একবার তাহাদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু এখানেই মৌরসী পাট্টা করিয়া বসিয়াছে!

সেদিন বিকালের দিকে আমি বাগানে বসিয়াছিলাম; নিতাই অদূরে ফুল গাছের কাছ হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলিতেছিল। সহসা বাগানে প্রবেশ করিল মিত্তিরদের বাড়ীর মল্লিকা। তাহার আগমনে আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম।

বারমাসই তাহারা কলিকাতায় থাকে, শুধু পূজার সময় 'পাখী-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা' গ্রামখানিতে ফিরিয়া আসিয়া মাস দুই থাকিয়া পল্লীর সুষমা-মণ্ডিত-স্নেহ শীতল-স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া যায়।

মল্লিকা আমার অপেক্ষা বছর চারেকের ছোট; বেশ সুশ্রী গড়ন, শহরের আদব-কায়দা-দুরস্ত মেয়ে। দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। পূজার সময় তাহার সঙ্গে আমায় ভাব হইয়া গিয়াছে, কথায়-বার্ত্তায় তাহার আর কোন সঙ্কোচ নাই।

মল্লিকা সহাস্য-মুখে বলিল—'তোমাদের বাগানে বেড়াতে এলুম মণিদা'; চলো, দেখি কি কি ফুল আছে?'

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—'চলো, সব ফুল এখনো ফোটে নি'।'

সে আমার পাশে পাশে চলিতে লাগিল; যে যে ফুলগুলির সে প্রশংসা করিতেছিল, তাহা হইতে দুটো একটা তুলিয়া তাহার হাতে দিলাম, খুসীতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

সে বলিল – 'বাঃ বেশ হ'বে, আজ্‌কে বাবার ফুলদানি দু'টো সাজিয়ে দেব'খন! বাবাও ফুল খুব ভালবাসেন কি না, ভারি খুসী হ'বেন।' তাহার চোখে-মুখে আনন্দউচ্ছ্বাস, পুলক-শিহরণ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আর যে ক' দিন তোমরা এখানে আছ, রোজ ফুল নিয়ে যেও।'

তাহার আনন্দ আর ধরে না; সে বড় বড় চোখ দুটী বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'রোজ দেবে? তোমার মামাবাবু তোমাকে বক্‌বেন না?'

আমি মৃদু হাসিয়া তাহার ফোলা ফোলা তুল্‌তুলে গালদুটী একটু টিপিয়া দিয়া বলিলাম—'না, তিনি কিছু বল্‌বেন না, তুমি রোজ এস।'

'আচ্ছা' বলিয়া ফাগমাখা মুখে মল্লিকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; তাহার আঁচল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; আমি অপলক-নেত্রে তাহার চলিবার চঞ্চল ভঙ্গিমার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

লোক-চক্ষুর অগোচরে, আমার হৃদয়-রাজ্য দিয়া মকর-কেতনের রথ বিজয় নিশান উড়াইয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেল কি না কে জানে?

নিতাই কখন চলিয়া গিয়াছে জানি না।

একটা ঝোপের ভিতর হইতে সহসা আমার সম্মুখে বাহির হইয়া আসিল—শচীন; তাহার মুখে বিকট হাসি, চোখে প্রলয়-দৃষ্টি। সে আমার পিঠ্‌ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল—'ব্রেভো মণি, 'সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং

ওয়াটার!' ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ বাবা! বেশ শিকার জুটিয়েছ ভাই, কবে থেকে এই লীলা খেলা হচ্ছে? বেশ আছ কিন্তু!'

এক নিঃশ্বাসে সে এই কথা কয়টী বলিয়া হাসিয়াই একেবারে অস্থির।

লজ্জায় এবং ক্রোধে আমার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। আমি তীব্রস্বরে বলিলাম—'ইতরের মত কি বল্‌ছিস্? ভদ্রভাবে কথা কইতে শেখ্। সকলকেই বুঝি নিজের মত মনে করিস্ ষ্টুপিড্!'

প্রথমটায় সে একটু দমিয়া গেল, পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু ব্যঙ্গ ভরে বলিল—'ভারি যে ভদ্রতা দেখাচ্ছ? নিজে অন্যায় কর্‌তে পারবে, আর আমি বল্‌লুম বলে' হলুম ইতর, চমৎকার! তুমি ভদ্র বলেই না একজন ভদ্রলোকের কুমারী মেয়ের গাল টিপে সোহাগ করা হচ্ছিল? আর কি করেছ তাই বা কে জানে; কে আর দেখ্‌তে গেছে!'

আমার মুখখানা একেবারে কালামাখা হইয়া গেল; আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, মুখ দিয়া একটাও কথা বাহির হইল না।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—'লায়ার, ইডিয়েট্।'

সে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—'লায়ারই বটে। প্রয়োজন হ'লে প্রমাণ দিতে বিশেষ বেগ পেতে হ'বে না, এ' তুমি নিশ্চয় জেন'!' তারপর সে শিস্ দিতে দিতে বিজয় গর্ব্বে চলিয়া গেল।

পরাজয়ের দারুণ গ্লানিতে আমি একবারে মুসড়াইয়া পড়িলাম। আমার বুকের ভিতর তখন তুফান উঠিয়াছে। মনে হইল—মল্লিকার গালে হাত দিয়া সত্যই আমি অন্যায় করিয়াছি। ছিঃ ছিঃ মামীমা

কিংবা মামাবাবুর কানে যদি এ' কথা যায়, তাঁহারা কি মনে করিবেন ? আমি একেবারে মরমে মরিয়া গেলাম। মন্‌টা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল ; আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা ভাবিয়া দেখিয়া নিজের প্রতি ঘৃণা বোধ হইল।

—আট—

ক'য়দিন আর আমি মল্লিকার সহিত দেখা করি নাই; সে সাহসও ছিল না। নিতাইকে বলিয়া দিয়াছিলাম মল্লিকা আসিলে তাহাকে যেন সে কিছু ফুল দেয়। আমার অন্তঃস্থলে একটা কাঁটা বিঁধিয়া যেন খচ্ খচ্ করিতেছিল, কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলাম না।

সে'দিন মনটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল; সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে একবার বাগানের দিকে গেলাম। দেখিলাম—শচীন পেয়ারা গাছে উঠিয়া একটা লম্বা ডালের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ডাঁসা ডাঁসা পেয়ারা খাইতেছে; গাছের নীচে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মল্লিকা। তাহার এক হাতে ফুলের গুচ্ছ, আর এক হাতে কয়েকটা পেয়ারা। আমি ফিরিয়া আসিতেছিলাম; সহসা গাছ হইতে ডাক আসিল—'মণি,' এদিকে আয়।' সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকাও ফিরিয়া আমাকে দেখিয়া ডাকিল—'এস' মণিদা'।'

তাহাদের ডাক উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে পা দুইটা চালাইয়া দিলাম। শচীন কয়েকটা বড় বড় পেয়ারা লইয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল। আমার হাতে গোটা দুই পেয়ারা দিয়া, বাকীগুলি মল্লিকার হাতে তুলিয়া দিল। মল্লিকার মন খুসীতে ভরিয়া গেল। শচীনের চোখে-মুখে একটা অপরিসীম তৃপ্তি

আমরা তিন জনে অদূরে সানবাঁধান ঘাটের উপর গিয়া বসিলাম।

প্রথমেই মল্লিকা আমাকে এ' কয়দিন না আসিবার জন্য অভিমানভরে অনুযোগ করিতে লাগিল।

বাগানে না আসিবার যথার্থই কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। আমি আম্‌তা অম্‌তা করিয়া বলিলাম—'আমার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না।' মল্লিকার দিক্ হইতে আর কোন উত্তর আসিল না; কিন্তু শচীন আমার দিকে চাহিয়া'ফিক্' করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, মুখখানা নিমিষে একেবারে সাদা হইয়া গেল।

শচীন বোধ হয় আমার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া গেল।

মল্লিকা আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—'এবার তো আমরা কল্‌কাতা চলে যাচ্ছি মণিদা।' আবার কবে আস্‌ব কে জানে? আমার কিন্তু সেখান থেকে এখানেই ভাল লাগে, বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম স্থান; আর সেখানে খালি একঘেয়ে ধূলা, ধোঁয়া এবং গাড়ী-ঘোড়ার বিশ্রী শব্দ ও লোকজনের কোলাহল; মনপ্রাণ একেবারে বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে। আমি তো এখানে এসে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি, বাবার কিন্তু ভাল লাগে না।'

অমি বলিলাম—'আমার কাছে কিন্তু পল্লীর চেয়ে শহরই ভাল লাগে। অনেক দিন আগে মামাবাবুর সঙ্গে বড়দিনের সময়ে একবার কল্‌কাতা গিয়েছিলুম, ভারি চমৎকার লেগেছিল। আর একটা মাস গেলেই তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা, পাশ কর্‌তে পার্‌লে তো কলকাতাতেই পড়্‌ব।'

মল্লিকা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—'তবে তো তখন আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে পারবে।'

আমি মৃদু হাসিয়া তাহার জবাব দিলাম।

শচীনকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মল্লিকা তাহাকে প্রশ্ন করিল—'তোমার কোন্‌টা ভাল লাগে বল্‌লে না শচীদা'?'

শচীন হাসিয়া বলিল—'শহর কখন' দেখিনি বলেই হয় তো তার প্রতি লোভ একটু বেশী। এটাই তো স্বাভাবিক মল্লিকা!'

মল্লিকা হাসিয়া বলিল—'আমাদের সঙ্গে চল না শচীদা' কিছুদিন থেকে সব দেখে-শুনে আস্‌বে!'

শচীনও হাসিয়াই জবাব দিল—'ও আমি বল্‌লুম বলে' বুঝি?' আমাকে আর বল্‌লে কই? যাকে তুমি ভালবাস, তাকাকেই তো যাবার কথা বল্‌লে।'

মল্লিকার মুখখানা সিঁদুর—রাঙা হইয়া গেল। সে ধীরকণ্ঠে বলিল 'বারে, কখন তা' বল্‌লুন? আমার কাছে দু'জনেই সমান। তোমার মন তো ভারি কুটিল শচীদা'!'

শচীন হাসিয়া জবাব দিল—'তুমি যা' বল্‌লে তা একটুও সত্যি নয় মল্লিকা! একজনের কাছে দু'জন কখনো সমান হ'তে পারে না।'

'তোমার সঙ্গে কে কথায় পারবে বল?' বলিয়া মল্লিকা চুপ করিয়া গেল।

এই প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়া গেল।

* * * * * *

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি মামীমার ঘরে একখানি ইজিচেয়ারে

বিশ্রাম করিতেছিলাম ; মামীমা মেজেতে বসিয়া মামাবাবুর রুমালে ফুল তুলিতেছিলেন।

নিতাই আসিয়া সদ্য-আগত 'কল্লোলিনী' কাগজখানা দিয়া গেল। মামীমা দুই একখানি পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া কাগজখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'ভাল দেখে একটা গল্প পড়্ তো শুনি।'

আমি চট্ করিয়া সূচীপত্রটা দেখিয়া লইয়া ভোলানাথ ভাদুড়ীর কথানাট্য পড়িতে আরম্ভ করিলাম। গল্পাংশ বিশেষ কিছুই নয় ; কেমন করিয়া তিন জন বন্ধু একজন নব-পরিচিত বন্ধু-পত্নীর স্নেহ পায়, তারপর বান্ধবীর বাড়ীতে তাহাদের যাতায়াতের ও ভোজনের মাত্রা বাড়াইয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তাহাদের ছলনায় কেমন করিয়া তাহাদিগকে একে একে বিতাড়িত হইতে হয়। এই সামান্য বিষয় বস্তুকে লেখক তাহার কলমের যাদুস্পর্শে কি চমৎকার কৌশলে লিখিয়াছেন। মামীমা তাহার ভারি প্রশংসা করিলেন। বলিলেন—'এ কাগজে অনেক দিন এমন গল্প পড়িনি রে মণি! বন্ধুদের নামগুলোও দিয়েছে বেশ কিন্তু, তকিমাকার।'

ইহার পর কোন্ গল্পটা পড়িব মনে মনে তাই ঠিক করিতেছিলাম ; এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল মল্লিকা ও তাহার মা। মামীমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একখানি মাদুর পাতিয়া তাহাদের বসিতে দিলেন তারপর সুখদাকে ডাকিয়া শীঘ্র পাণ লইয়া আসিতে হুকুম করিলেন।

মল্লিকার মা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'অত ব্যস্ত হয়ো না দিদি ; কাল আমরা কল্‌কাতা চলে যাচ্ছি কিনা, তাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলুম।'

কালই চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া মামীমা খুব দুঃখ করিয়া বলিলেন—'এবার এরি মধ্যে চলে যাচ্ছ? আবার তো সেই কবে আস্‌বে?'

'ওঁর ছুটি ফুরিয়ে গেল, কি কর্‌ব বল? নইলে আমার তো আর কিছুদিন থেকে যাবারই সাধ ছিল।' বলিয়া মল্লিকার মা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'পাশ করে কল্‌কাতাতেই তো পড়্‌তে যাবে মণি, আমাদের সঙ্গে দেখাশোনা কোরো কিন্তু!'

আমি হাসিয়া সম্মতি জানাইলাম।

মামীমা বলিলেন—'তা' তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌বে বই কি।' তারপর মামীমা মল্লিকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'আজ আর ছাড়্‌ছি না তোমায়। কি গান শিখেছ শোনাতে হ'বে।'

মল্লিকা তাহার ডাগর ডাগর চোখ দুটী তুলিয়া একটু সলাজ হাসি হাসিয়া আঙুলে কাপড়ের আঁচলটা জড়াইতে লাগিল।

তাহার মা তাহার পিঠে একটু ঠেলা দিয়া বলিল—'দেনা, মাসীমাকে একখানা গান শুনিয়ে।'

মামীমা সুখদাকে ডাকিয়া পাশের ঘর হইতে হারমোনিয়ামটা দিয়া যাইতে বলিলেন। সে তখনই সেটা দিয়া গেল।

মামীমা মল্লিকাকে বলিলেন—'লজ্জা কি, গাও না?'

সে তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হারমোনিয়ামটাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মধুর স্বরে গাহিতে লাগিল:—

ফাগুনে কার পরশ পেয়ে,
শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে?

নারীর রূপ

বনের কোকিল গায় গো গীতি,
মানস-মধুপ গুঞ্জরে।
ভেঙ্গে ফেলে পাষাণ-কারা,
ছুট্‌ছে বেগে ঝরণা ধারা,
মানব আজি স্বপ্নে রচে
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ রে।

গান শুনিয়া মামীমা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বলিলেন – 'মনে', খাসা মেয়ে তৈরী করেছিস্। ইচ্ছে করে একে আমার মণির বউ করি।'

মল্লিকার মা হাসিয়া বলিলেন—'এমন ভাগ্যি কি ওর হ'বে? এতে আমার আর অসাধ কি?'

মল্লিকার মুখখানি রাঙা হইয়া গেল।

আমি এক পা দুই পা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম।

বাহিরে আসিয়া শুনিলাম—মামীমা বলিতেছেন—'ঐ দেখ,' লাজুক ছেলে পালিয়েছে।'.........

মল্লিকাদের সঙ্গে নদীর ঘাট অবধি আসিয়াছিলাম। ঘাটে একখানি বড় নৌকা প্রস্তুত। প্রায় মাইল তিনেক গিয়া তবে ষ্টীমার ধরিতে হইবে। মল্লিকার মুখখানি একেবারে শুখাইয়া গিয়াছে, সে আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিল—চিঠি লিখ্‌লে জবাব দিও মণি দা'। সত্যি, তোমাদের জন্য আমার মন কেমন কর্‌ছে।'

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম যে, পত্রের উত্তর দিব। শচীনও আমার সঙ্গে ছিল, তাহাকেও সে ঐ অনুরোধ করিয়া গেল।

নারীর রূপ

নৌকা ছাড়িয়া দিল, ভাঁটার টানে তর্ তর্ করিয়া নৌকা ছুটিয়া চলিল। যতক্ষণ দেখা যায়, আমি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। অদৃশ্য হইয়া গেলে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিলাম। বুকের ভিতর সত্যই কেমন একটা যাতনা অনুভব করিতেছিলাম; আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

শচীন হাসিয়া বলিল—'কেঁদে ফেল্‌লি না কি রে?' তারপর খানিকটা আসিয়া সে সুর করিয়া গান ধরিল :—

'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী
উড়ে গেল, আর এলো না।'

'থাম্। ইয়ার্কি ভাল লাগে না।' বলিয়া তাহার পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া সন্মুখ দিকে ছুটিয়া চলিলাম।

—নয়—

কয়দিন হইতে মনটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল ; প্রতিমুহূর্ত্তে মল্লিকার কথা মনে হইয়া আমাকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। ক্ষ্যাপা দক্ষিণ হাওয়ার মতই সে ক্ষণিকের জন্য আসিয়া সব ওলটপালট করিয়া দিয়া গেল। কিছুতেই তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না।

বিকাশোন্মুখ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনে এমন একটা সময় আসে, যখন পুরুষের কাছে নারীর এবং নারীর কাছে পুরুষের সঙ্গ মনোরম লাগে—প্রাণে একটা নব শান্তিধারার পুলক-উৎস আনিয়া দেয়। কেহই তখন বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না ; যেখানে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানেই বুভুক্ষু হৃদয় আকুলস্বরে কাঁদিয়া ওঠে।

পরীক্ষার আর বেশীদিন দেরী ছিল না।

আমি আমার ঘরে বসিয়া আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম।

নিতাই একখানি চিঠি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে আমার ঘরে প্রবেশ করিল। মামীমা বোধ হয়, পূর্ব্বেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে,—এখানি আমার চিঠি, কাজেই তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এখানে আসিবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার নামে কখন কোন চিঠিপত্র আসে নাই,—এই প্রথম চিঠি !

বিস্মিত হইবারই কথা।

মামীমা দ্বারের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসু-নয়নে প্রশ্ন করিলেন—'কার চিঠি এল' রে মণি?'

চিঠি তখনও খোলা হয় নাই। 'দেখ্‌ছি।' বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা ধার ছিঁড়িয়া পত্রখানি বাহির করিয়া প্রেরকের নামটা দেখিয়া বলিলাম—'মল্লিকা লিখেছে মামীমা।'

'কি লিখেছে? পড়্‌ তো! ভাল আছে তারা?' বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল; চিঠিতে কি লিখিয়াছে কে জানে? যদি কোন বাজে কথা থাকে? ছিঃ ছিঃ মামীমা তবে কি মনে করিবেন? চিন্তাটা মনে আসিতেই এক-ঝলক রক্ত সমস্ত মুখখানিকে লজ্জার ছোপ্‌ মাখাইয়া দিল।

ধীরে ধীরে চিঠিখানির ভাঁজ খুলিয়া শঙ্কিতকণ্ঠে পড়িতে লাগিলাম:—

'শ্রীচরণেষু—

মণিদা', আমরা ভালয় ভালয় এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানে এসে আমার একটুও ভাল লাগ্‌ছে না, সর্ব্বদাই তোমাদের কথা মনে। হয়।

মাসীমা ও মেসোমশাইকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিও এবং তুমি নিও। শচী'দাকে আমার কাছে চিঠি দিতে বলো।

তুমি আমার ভালবাসা জেনো। শীঘ্র উত্তর দিও। ইতি

প্রণতা

কুমারী মল্লিকা মিত্র।'

মামীমা খুব খুসী হইয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিলেন—'দেখি, মল্লিকার হাতের লেখা কেমন ?'

আমি ধীরে ধীরে চিঠিখানি মামীমার হাতে তুলিয়া দিলাম। তিনি ভাল করিয়া সেখানি দেখিয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'বাঃ, বেশ সুন্দর লেখা তো।' তারপর তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি একটা অপরিসীম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম।

মল্লিকার চিঠি পাইয়া মনে মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু 'তুমি আমার ভালবাসা জেনো' কথাটা পড়িবার সময় কি জানি কেন বড় লজ্জা করিতেছিল।

মামীমা মনে মনে কি ভাবিলেন কে জানে ?

ঐ তো সামান্য কয় লাইন লেখা, উহার মধ্যে এমন কি যাদু আছে যে, বার বার পড়িয়াও যেন আশা মিটিতেছিল না, যত পড়ি, কিছুতেই যেন তৃপ্তি হয় না।

চিঠিখানিকে বুকে রাখিয়া মনে মনে আশার কত রঙীন জালই না বুনিতেছিলাম। মহাযোগীর মতই ধ্যানে বিভোর ছিলাম।

কখন শচীন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে টের পাই নাই; হঠাৎ চাহিয়া দেখি—সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমার মুখ একেবারে শুখাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি গোপন করিতে গেলাম, কিন্তু তাহার শ্যেনদৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারিলাম না। সে হাসিয়া বলিল- 'কার চিঠি দেখি মণি ?'

আমি কোন আপত্তি করিতে পারিলাম না; ধীরে ধীরে সেখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম।

সে সেখানি পড়িয়া ফেলিয়া আপন মনেই একচোট্ খুব হাসিয়া লইয়া বলিল—'বাঃ রে মণি! 'ইউ আর এ লাকী ডগ্' এতে 'প্রিয়তম' আর 'প্রাণেশ্বরী' এই দু'টো কথা জুড়ে দিলে বেশ একখানি সরস প্রেম-পত্র হয়। আমি তোদের শুভ-মিলন কামনা করি।'

তাহার এই রসিকতায় সে নিজেই হাসিয়া একেবারে অস্থির হইল।

আজ আমার বড় রাগ হইল; বেশ একটু দীপ্তকণ্ঠেই বলিলাম—'ছোট লোকের মত কি ইয়ার্কি করিস্? এতে প্রেম-পত্রের মত কি দেখ্‌লি? মামীমা তো স্বচক্ষেই এই চিঠি দেখে গেলেন!'

শচীন হাসিয়া ব'লল—'পিসিমা কি তোমাদের গাল টেপাটিপির কথা জানেন? চল, আগে তাঁকে সেই ব্যাপারটা ব'লে চিঠিখানা শুনিয়ে আসি, তিনি কি বলেন দেখি?'

আমি দমিয়া গেলাম; তারপর স্বরটাকে একটু কোমল করিয়া বলিলাম—'আচ্ছা শচীন, তুই যখন তখন যে এমন করে ঠাট্টা করিস্, সে দিন কি কোন খারাপভাবে মল্লিকার গালে হাত দিয়েছিলুম?'

সে ব্যঙ্গভরে বলিল—'না, কে বল্‌লে? তুমি তো ভালবেসে তার তুল-তুলে গালে হাত বুলিয়েছিলে; অমনি একটা চুমু খেলেই পারুতে!' তাহার মুখে হাসি একেবারে উছলিয়া উঠিল।

বুঝিলাম—সে নিজে মল্লিকার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত বলিয়াই, হিংসায় একেবারে মরিয়া যাইতেছে; তাহার বুকে তুষের আগুন।

আমি একেবারে মৌন হইয়া রহিলাম।

মনে করিয়াছিলাম, মল্লিকার চিঠির আর কোন জবাব দিব না? কিন্তু উত্তর না দিবার কারণটা কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

শেষ পর্য্যন্ত জবাব দিতেই হইল। দু'তিন খানা কাগজ নষ্ট করিয়া ছোট করিয়া একটি জবাব লিখিয়া দিলাম।

—দশ—

পরীক্ষার ফল বাহির হইতে তখনও অনেক দেরী ; ইহার মধ্যে একদিন মামাবাবুর এক বন্ধু তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন—আমি প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি। মামাবাবুর আনন্দ আর ধরে না ; ভাগিনেয়-গর্ব্বে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি বাড়ীতে বেশ একটু উৎসবের আয়োজন করিলেন।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম যে, পাশ করিব ; সেইজন্য না হইলেও কলিকাতায় যাইতে পারিব, সেখানে মল্লিকার সঙ্গে দেখা হইবে এই আনন্দে আমার অন্তর পুলকে ভরিয়া গেল। এখন হইতে মনে মনে স্বপ্নজাল বুনিতে লাগিলাম।

মামীমাও খুব খুসী হইলেন ; কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িয়া সুদূর কলিকাতায় থাকিতে হইবে শুনিয়া, আসন্ন-বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর বেদনাতুর হইয়া পড়িল। আমার আদর যত্ন আরও বাড়িয়া উঠিল। আমি যে সকল খাদ্য ভালবাসি নিত্য তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। সমস্ত দুপুরটা তিনি আমার ঘরেই কাটাইতে লাগিলেন। কোন দিন গল্প পড়িয়া, কিংবা কোন দিন গল্প করিয়া একঘেয়ে সময় কাটিয়া যাইতেছিল। আমি কিন্তু মনে মনে একটু বিরক্ত হইতেছিলাম ; এতদিন তো বই লইয়াই, কাটিয়াছে, কোথাও একটু বাহির হইতে পারি নাই ;

আজ যদি বা একটু অবসর মিলিল তো সারাদিন মামীমার চোখে চোখেই থাকিতে হইবে, স্নেহের কি অত্যাচার!

একটা দমকা হাওয়ার মতই শচীন আমার ঘরে ঢুকিয়া বলিল—তুমি তো ভাই কল্‌কাতা চল্‌লে, মুস্কিল হ'বে আমারই; একেবারে নিঃসঙ্গ একা। কি ক'রে যে, দিন কাটাব'? তোমার সেখানে নিত্য নূতন বন্ধু জুটবে, থিয়েটার, বায়স্কোপ আছে, তা' ছাড়া সব চেয়ে সেরা তোমার মল্লিকা সেখানে; বেশ সুখেই দিনগুলো তোমার কাটবে! তোমার সুখের দিনে আমাকে একেবারে ভুলে যেয়ো না, একটু আধ্‌টু খবর আমায় দিও কিন্তু!'

কি জানি কেন আজ তাহার উপর আমার কোন রাগ কিংবা অভিমান আসিল না। আমি 'ফিক্‌' করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

শচীনের আজ অনেকখানি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। তাহার মুখের হাসি যেন মিলাইয়া গিয়াছে। সে আমার দিকে তাহার ব্যথাতুর-দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—'মণি, আজ তোকে একটা সত্য কথা বল্‌ছি, তুই বিশ্বেস করিস্‌। মল্লিকা তোকে সত্যি খুব ভালবাসে; মাঝে তুই দিনকতক বাগানে যাস্‌ নি, সেই সময় তার সঙ্গে তোর-সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হ'য়েছে;. মিথ্যা কথা বলে' তোর অনেক নিন্দা করেছি সে কিন্তু অটল। মনে করেছিলুম তোর নিন্দে কর্‌লে হয় তো সে তোকে ছেড়ে আমাকেই ভালবাস্‌বে, সেই আশাতেই অতটা এগিয়েছিলুম। সে আমার দুরাশা, তাকে একটুও টলাতে পারি নি; সে বোধ হয় আমার ছলনা বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই তার কাছে পেয়েছি নিছক

অবহেলা। তুই তার ভালবাসার অমর্য্যাদা করিস্ নি, এই আমার অনুরোধ, আর পারিস্ তো আমাকে ক্ষমা করিস্!'

অবাক্-বিস্ময়ে আমি একেবারে হতবাক্। তাহাকে কিছুই বলা হইল না।.........

পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে; সত্যই আমি প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছি। কলেজ খুলিয়া গিয়াছিল; ভর্ত্তি হইবার জন্য আমি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

মামাবাবু তাঁহার বন্ধুকে চিঠি লিখিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল—হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িব।

একটা ভাল দিন স্থির করিয়া মামীমা নিজের হাতে আমার সমস্ত দ্রব্য গুছাইয়া দিলেন।

নবীন উদ্যমে আমার প্রাণ নাচিয়া উঠিল; ভবিষ্যতের রঙীন আশায় মনে মনে কত আকাশকুসুমেরই না সৃষ্টি করতে লাগিলাম।

বিদায়ের দিন আসিয়া পড়িল।

মামীমার ব্যথিত হৃদয় চূর্ণ করিয়া, তাঁহার চ'খের জলে দেহ অভিষিক্ত করিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার দেওয়া নারায়ণের প্রসাদ লইয়া কোন্ অজানা ভবিষ্যতের মঙ্গল-কামনায় কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

—এগার—

কলিকাতার দিনগুলি আমার খুব আনন্দেই কাটিতেছিল।

নূতন ক্লাস, পড়াশোনার বিশেষ চাপ্ ছিল না, তাহার উপর হোষ্টেলে বন্ধুও জুটিয়াছিল অনেকগুলি; তাহারা যখন জানিয়া ফেলিল যে, আমি জমিদারের ভাগিনেয়, বাস্, আর যাই কোথা? তাহারা আমাকে একেবারে 'লুফিয়া' লইল। নানা ভাবে তাহারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও আনন্দের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম। নব পরিচিত বন্ধুদের লইয়া রেষ্টুরেন্টে খাইয়া এবং নিত্য নূতন থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিয়া দিনের পর দিন খুব হৈ-চৈ করিয়া কাটাইয়া দিতে লাগিলাল।

বুকে বড় আশা লইয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছিলাম।

মল্লিকার দেখা পাইব বলিয়া মনে মনে কতই না কল্পনার জাল বুনিয়াছিলাম! কিন্তু এখানে আসিয়া একেবারেই যে তাহাকে ভুলিতে বসিয়াছি; এ' কয়দিনের মধ্যে সময় করিয়া একদিনও তাহাদের ওখানে যাইয়া উঠিতে পারি নাই। মনে মনে অনেকদিন তাহাদের বাড়ী যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছি; কিন্তু বন্ধুদের জ্বালাতনে শেষ পর্যান্ত আর সেখানে যাওয়া হইয়া উঠে নাই। অদৃষ্টের কি পরিহাস!

মামীমা চিঠি লিখিয়া প্রায়ই আমাকে মল্লিকাদের বাড়ী যাইতে

লিখিতেন। আমিও জবাবে জানাইতাম যে, সময় পাইতেছি না, সুবিধা হইলেই একদিন মল্লিকাদের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।.........

কলেজে আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল বিনোদ। বাড়ী তাহার বাগবাজারে। প্রায়ই সে আমাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিত। 'আজ নয়, আর এক দিন' বলিয়া বহুবার তাহার নিকট সময় লইয়াছি। সেদিন কিন্তু সে আর আমাকে ছাড়িল না। ছুটির পর বিনোদ আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।

বিনোদ ধনীর সন্তান, তাহাদের প্রকাণ্ড বাড়ী; প্রত্যেকটী ঘর সুসজ্জিত। সে আমাকে একেবারে বাড়ীর ভিতর নিয়া হাজির করিল। তাহার বাড়ীর মেয়েরা খুব 'আপ-টু ডেট্' আমাদের দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেলেন না; বরঞ্চ আমিই একেবারে ঘামিয়া উঠিতেছিলাম। বিনোদ সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিল; তাহার মায়ের কথায় বুঝিলাম—বিনোদ তাঁহাকে পূর্ব্বেই আমার পরিচয় দিয়াছিল; আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। 'বেঁচে থাক বাবা' বলিয়া তিনি আমার মাথায় তাঁহার মঙ্গল-হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিনোদের পড়িবার ঘরে বসিয়া দুইজনে গল্প করিতেছিলাম; হঠাৎ টেবিলের এক পাশে একখানি বাঁধান খাতার উপর আমার দৃষ্টি পড়িল; পরম আগ্রহে সেখানি তুলিয়া লইলাম। দেখিলাম সেখানি কবিতার খাতা, এবং তাহার লেখক স্বয়ং বিনোদ। আনন্দে এবং গর্ব্বে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; মনে হইল—আমার এই আবিষ্কার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। হর্ষোৎফুল্ল-চিত্তে একে একে খাতার পাতা

উলটাইতে লাগিলাম। এই ভাবে ধরা পড়িয়া দারুণ লজ্জায় বিনোদের মুখখানি রাঙা হইয়া গেল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—'এ পাগ্‌লামিগুলো আর পড়ো না ভাই!'

আমি অবাক্ বিস্ময়ে বলিলাম—'পাগলামী কি বল্‌ছ বিনোদ? তুমি 'জিনিয়াস' আমি অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি এখনও তুমি কোন মাসিক পত্রিকায় এগুলো প্রকাশ করতে দাওনি দেখে।'

বিনোদ হাসিল; বলিল—'তুমি ক্ষেপেছ মণি? তারা এ' রাবিস্ ছাপ্‌বে কেন? তুমি না হয় ভালবাসার আতিশয্যে বন্ধুর এতটা প্রশংসা করছ।"

আমি জোর দিয়া বলিলাম—'নিশ্চয়ই ছাপ্‌বে, আমার অনুরোধে তুমি একবার পাঠিয়েই দেখ' না।'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে 'খন।' বলিয়া বিনোদ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—বিনোদের 'বৌদি'; তাঁহার দুই হস্তে খাবার বোঝাই দুইখানি রেকাবী। যেন মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা। তাঁহার পেছন পেছন আসিল—বিনোদের ছোট বোন্ কিরণ; তাহার দুই হাতে জলপূর্ণ দুইটী কাঁচের গ্লাস।

বৌদি' আমার সম্মুখে একখানি ডিস্ নামাইয়া রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'আগে খেয়ে নাও ভাই, তারপর গল্প করো বসে' সেই কখন তো খেয়ে কলেজে গেছো!'

আমি রাঙা হইয়া উঠিলাম; কিছু বলিতে পারিলাম না, শুধু একটু হাসিলাম।

বৌদি' বলিলেন—'অনেক দিন থেকেই ছোট্‌-ঠাকুরপোর কাছে, তোমার কথা শুনেছি; কতদিন থেকে তোমাকে নিয়ে আস্‌তে বল্‌ছি তা' আর তোমাদের সময় হয়ে ওঠে না। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে? তোমায় কিন্তু এখন থেকে নতুন ঠাকুরপো' বলে' ডাক্‌ব, রাগ করো না ভাই।' তাঁহার মুখে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ হাসি।

আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। প্রথম পরিচয়েই মানুষ পরকে যে এমন নিবিড়ভাবে আপন করিয়া লইতে পারে তাহা এই প্রথম দেখিলাম। হাসিয়া বলিলাম—'বেশ' আপনার যা ভাল লাগে তাই বলেই ডাক্‌বেন আমাকে।'

বৌদির মুখখানি আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

মোহনপুরীতে একটা কামড় দিয়া বলিলাম—'আপনাদের এখানে এসে আজ আমার অনেক লাভ হল।' বিনোদ যে কবি তা' আবিষ্কার করলুম, আর আপনার মত একজন স্নেহময়ী বৌদি' পেলুম। সত্যি আমি খুব ভাগ্যবান্‌!'

বৌদি' হাসিলেন, বলিলেন—'মাঝে মাঝে এলে অনেক কিছু পাবে ভাই। পরে কিরণকে দেখাইয়া বলিলেন—'আজ শুধু এই টুকু জেনে যাও—আমার এই ননদটী একটি সু-গায়িকা!'

কিরণের মুখখানা একেবারে ফাগ মাখা হইয়া গেল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—'যে লোভ দেখালেন, এর পর হয় তো আমাকে প্রায়ই আস্‌তে হবে, তখন বিরক্ত না হলে হয়।'

বৌদি' হাসিয়া বলিলেন—'মানুষের কাছে মানুষ এলে, কখোন বিরক্তি হয় ঠাকুর-পো?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। বিনোদের খাতার সর্ব্বশেষ কবিতাটা দেখিয়া হাসিয়া বলিলাম—'বিনোদ আপনাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছে, দেখেছেন বৌদি' ?'

তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, বলিলেন—'আমাকে নিয়ে কবিতা ? কই, শুনি নি তো !'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'তবে শুনুন। কবিতাটীর নাম দিয়েছে 'স্ক্রেপ' তারিখ কাল্‌কেকার।' বলিয়া পড়িতে লাগিলাম :—

বৌদি'র আজ আস্‌বে না ঘুম
আঁখির পাতে ;
সারারাত হাস্‌বে খালি
কুন্দ-দাঁতে।
আর্শিতে দাঁত দেখ্‌বে খালি,
শূন্য রবে পাণের ডালি,
এবার থেকে আগিয়ে দেবে
মশ্‌লা হাতে।
সারারাত হাস্‌বে খালি
কুন্দ-দাঁতে।

কবিতাটী শুনিয়া বৌদি' খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন ; তাঁহার হাসি আর থামিতে চায় না। বহু কষ্টে হাসি থামাইয়া বলিলেন—'মা গো, ঠাকুরপো যেন কি !

আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'সত্যি, আপনি দাঁত ছুলিয়েছেন নাকি বৌদি' ?'

তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন—'হ্যাঁ ভাই, পাণ খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো বিশ্রী লাল হ'য়ে গিয়েছিল, তাই সেদিন একজন ডেণ্টিষ্টের কাছ থেকে 'স্ক্রেপ্' করিয়ে আনলুম। আর ঠাকুরপোর কীর্ত্তি দেখ'; অমনি লিখে বস্‌ল কবিতা·!'

তারপর তিনি বিনোদের দিকে ফিরিয়া স্নেহ-ভরা স্বরে বলিলেন—'আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি আমাকে নিয়ে কবিতা লিখ্‌লে, আর আমাকেই দেখালে না? ভয় নেই গো তোমার; আমিই না হয় পাণ খাব না, তোমাদের পাণ ঠিকই পাবে!'

বিনোদ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল! বলিল—'কবিতা তো মোটে কাল লিখেছি, মণি দেখালে বলে, নইলে আজ তো আমিই তোমাকে শোনাতুম এবং এর জন্য অন্ততঃ চারটে পাণ বেশী আদায় করে' নিতুম!'

খুসীতে বৌদি'র চিত্ত ভরিয়া উঠিল; বলিলেন—'বেশ, চারটে পাণ তোমার পাওনা রইল।'

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল অনেকক্ষণ। আমি বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আবার আসিবার জন্য বৌদি' বার বার বলিয়া দিলেন।

কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—'তোমার কাছে কিন্তু গান পাওনা রইল আমার। এবার যেদিন আস্‌ব, ফাঁকি দিলে চল্‌বে না, সে'দিন গান শোনাতে হ'বে কিন্তু!'

কিরণ হাসিয়া বলিল—'আচ্ছা!'

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে'দিন হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতেছিল—কি অপূর্ব্ব ইহাদের আদর-যত্ন এবং আতিথেয়তা!

—বার—

সেদিন আমরা সদলবলে 'প্লাজায়' গিয়াছিলাম বায়স্কোপ দেখিতে। কি একখানি ভাল বই ছিল। 'শো' শেষ হইলে বেশ পরিতৃপ্তির সহিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম—একখানি ট্যাক্সির উপর মল্লিকা বসিয়া আছে, তাহার পাশে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। মল্লিকার সহিত আলাপ করিব কি না, মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম।

হঠাৎ মল্লিকা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'মণিদা!'

সেই পরিচিত ডাক্! উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; বন্ধুর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার কাছে যাইতে কেমন বাধ বাধ লাগিতেছিল; তথাপি সেই দিকে পা-দু'টাকে ধীরে ধীরে চালাইয়া দিলাম।

খুসীতে মল্লিকার অন্তর ভরিয়া উঠিল; সে উচ্ছ্সিত কণ্ঠে বলিল—"আমাদের ওখানে গেলে না কেন মণিদা'? ভাল আছ তো? ভাগ্যিস ছোটমামার সঙ্গে বায়স্কোপে এসেছিলুম, তাই তোমার দেখা পেলুম। আজ আর ছাড়্‌ছি না তোমাকে, আমাদের ওখানে যেতে হ'বে কিন্তু! মা তোমায় দেখ্‌লে কত খুসী হ'বেন! উঠে এসো!'

বিষম ভাবনায় পড়িলাম। যাইব কি না তাহাই মনে মনে চিন্তা

করিতেছিলাম ; বুঝিলাম—মল্লিকার এ' প্রীতির আহ্বানকে উপেক্ষা করা চলে না। যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। মল্লিকাকে বলিলাম—'ওদের বলে 'আসি।'

বন্ধুদের কাছে বলিতে গিয়াছিলাম—হোষ্টেলে ফিরিতে রাত্রি হইবে।

তাহারা মল্লিকার পরিচয় চাহিয়া বসিল! সুরেশ তো কি একটা বিশ্রী রসিকতা করিয়া উঠিল ; আমার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল। তাহার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি ফেলিয়া আমি গম্ভীর-স্বরে বলিলাম, 'আমার মাস্‌তুতো বোন্।' কথাটা বলিয়াই বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

মনে হইল—তাহারা যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল। ট্যাক্সিতে উঠিতেই ষ্টার্ট দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীতে মল্লিকার সহিত বিশেষ কোন কথা হয় নাই ; তাহার ছোটমামার সহিত আলাপ-পরিচয় হইল।.........

বাড়ীর কাছে ট্যাক্সি থামিতেই মল্লিকা ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—'দেখবে এস' মা, কাকে আজ ধরে এনেছি!'

তিনি ব্যস্ত হইয়া আগ্রহের সহিত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বিস্ময়-ভরা-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কাকে রে মল্লিকা?'

আমাকে দেখিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—'এস' মণি, এস'! এতদিন কল্‌কাতায় এসেছ, এর মধ্যে একদিনও কি এদিকে আস্‌তে নেই বাবা? ভাল আছ তো?'

আমি তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলাম—ভালই আছি, সময় পাই না বলে' এতদিন আসা ঘটে নি।'

কোথায় আছি, কোন অসুবিধা হয় কি না ইত্যাদি জানিয়া লইয়া তিনি মল্লিকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'তুই তোর মণিদার সঙ্গে বসে গল্প কর, আমি এখুনি আস্‌ছি।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলিয়া গেলেন।

মল্লিকা আমাকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিল। ঘরখানি ছোট হইলেও বেশ সু-সজ্জিত; গৃহ-স্বামীর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই কয়েকমাসে মল্লিকা বেশ একটু বড়সড় হইয়াছে; তাহার সহিত কথা কহিতে আমার কেমন বাধ-বাধ লাগিতেছিল। মনে হইতেছিল যেন সে একটা আগুনের ফুল্‌কি। আমাকে লইয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না; একটা লাটিমের মতই ঘরময় ঘুরপাক্ খাইয়া ফিরিতেছিল। কখন তাহার বই দেখাইতেছিল, কখন বা তাহার হাতের শেলাই, বোনা ইত্যাদি দেখাইতেছিল।

আমি টেবিলের উপর হইতে তাহার গানের খাতাখানি তুলিয়া লইলাম। দেখিলাম—নূতন নূতন গানে তাহার খাতাখানি ভরিয়া উঠিয়াছে। আমি হাসিয়া বলিলাম—'বাঃ অনেক গান শিখেছ যে মল্লিকা, দু'-একখানা শোনাবে না?'

সে পুলকিত হইয়া উঠিল; সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে অর্গ্যানটার কাছে গিয়া বসিল।

আমি তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিলাম।

সে অর্গ্যান্‌টার ঢাক্‌না তুলিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে একখানি গজল গাহিতে লাগিল:—

শিশির-সিক্ত মৌন বীথি,
কাঁদে আজি কার লাগি' গো?

বৃথায় আমি গাঁথি নিতি
ফুলের মালা রাত জাগি' গো !
কই গো প্রিয়, কই গো তুমি ?
মিছা কেন ভুলালে গো ?
রাত্রি জাগি' স্মৃতি চুমি'
পরশ নাহি বুলালে গো ?

আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইতঃপূর্ব্বেও তো আমি মল্লিকার গান শুনিয়াছি, তখন এমন মধুর লাগে নাই তো ! এই কয়মাসে এত পরিবর্ত্তন ! আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না ; আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। মনে মনে আমি স্বপ্নজাল বুনিয়া কোন্ এক মায়াপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিলাম।

সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন মল্লিকার মাতা ; তাঁহার আগমনে আমি স-চকিত হইয়া উঠিলাম।

তিনি আমার সম্মুখে এক থালা গরম গরম ফুল্কো লুচি দিয়া বলিলেন—'একটু জল খেয়ে নাও বাবা ! '

মল্লিকা বলিল—'অত তাড়াতাড়ি কেন মা ? খাওয়া হ'য়ে গেলেই তো মণিদা' উঠে পালাবে !'

তিনি হাসিলেন ; বলিলেন—'পালাবে কেন ? খাওয়া হ'য়ে গেলে তুই তাকে গান শোনা না, তোর গান না শুনে সে যাবে না দেখিস্।'

তাঁহার বলিবার রকম দেখিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। মনে মনে স্বীকার করিলাম—গান শুনিয়া সত্যই উঠিয়া যাইবার ক্ষমতা আমার নাই।

মল্লিকার মা আমার সম্মুখে বসিয়া পরম স্নেহে, স-যত্নে পরিপাটি করিয়া ভোজন করাইলেন। তাঁহার আদর-যত্ন দেখিয়া আজ চট্ করিয়া মামীমার মমতাভরা চিরপরিচিত মুখখানি মনোদর্পণে ভাসিয়া উঠিল; তিনিও ঠিক্ এমনই করিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া আমাকে ভোজন করাইতেন!

পরিতোষসহকারে আকণ্ঠ ভোজন করিয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। মল্লিকাকে অনুরোধ করিতেই সে কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিল। সঙ্গীতে কি মাদকতা আছে কে জানে! আমি কিন্তু একেবারে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলাম। খুসীতে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল; তাহার কাজল-কাল চোখ দু'টী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দেহের উপর একটা পুলক শিহরণ খেলিয়া গেল। মল্লিকা যে সুন্দরী আজ যেন তাহা নূতন করিয়া অনুভব করিতেছিলাম।

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, আমি উঠিয়া দাড়াইলাম, বলিলাম—'আজ আসি, আর একদিন আস্‌ব।'

'একদিন মানে? রোজ আস্‌তে হ'বে মণিদা'!' বলিয়া মল্লিকা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমিও হাসিলাম। ইহার আর কি জবাব দিব?

মল্লিকার মা বলিলেন—'এ তোর অন্যায় আব্দার বাছা। পড়াশোনা কামাই করে' রোজ রোজ কি করে' আস্‌বে? তবে হ্যাঁ, শনি-র'ববারে আস্‌তে পারে! তা' আস্‌বে বই কি?'

মল্লিকা বলিল—'তুমি বোঝ না মা! বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে একবার এদিকে আস্‌তে পারেন না বুঝি?'

তাহার মা হাসিতে লাগিলেন।

আগামী রবিবার এখানে খাইবার জন্য মল্লিকার মা আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, আমি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিলাম।

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম; মল্লিকাও আমার সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা পর্য্যন্ত আসিল। বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে সে যেন কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল। কাতর-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বুকের ভিতরটা আমার কেমন করিয়া উঠিল; তাহার কাছে গিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিলাম—'লক্ষ্মীটী রাগ কর' না, আবার তো রব্‌বারে আস্‌ছি।'

সে তাহার ডাগর ডাগর চোখ দুটী তুলিয়া বলিল—'একটু সকাল সকাল এস' কিন্তু!'

'আচ্ছা' বলিয়া তাড়াতাড়ি পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

—তের—

রাত্রে শয্যায় শুইয়া মল্লিকার কথাই ভাবিতেছিলাম। সে যে সত্যই আমাকে খুব ভালবাসে, তাহা আমি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছি। এতদিন তাহার কাছে না যাওয়ার জন্য আজ তীব্র অনুশোচনা হইতে লাগিল। মনে হইল—এ ক'টা দিন বৃথাই গেল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র, নতুবা আমিই বা তাহার কথা এমন করিয়া ভাবিব কেন?

রবিবার সকাল সকাল স্নান করিয়া মল্লিকাদের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। মল্লিকা তাহাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; দূর হইতে আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। প্রভাত সূর্য্যেরই মত তাহার মুখখানি উজ্জল এবং সুন্দর দেখাইতেছিল।

তাহাকে দেখিতে আজ ভারি চমৎকার লাগিল, বিশেষ করিয়া তাহার মুখের চপল হাসিটী।

সে মধুর স্বরে বলিল—'এস মণিদা, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

আনন্দে আমার হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল, মৃদু হাসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। বসন্তের মলয় হাওয়ার স্পর্শে যেন একটা শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

বাড়ীর ভিতর গিয়া বসিলাম। তাহার পিতা বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মল্লিকা আসিয়া চা ও খাবার দিয়া গিয়াছে।

আমার বলিতে হইল না, মল্লিকার বাবাই বলিলেন—'বোস্ মা, দু'টো গান কর্ শুনি।'

আমি মনে মনে খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

মল্লিকা বলিল—'গান কি করে' গাইব বাবা? অনেক কাজ রয়েছে যে, মা একা কখন সব করবেন? সকাল সকাল খাবার যোগাড় করতে হ'বে তো!'

তিনি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—'বেটী যে পুরো সংসারী হ'য়ে উঠ্লি? একটু দেরী হ'লে কোন অসুবিধা হ'বে না, তুই গা! মনের ক্ষুধা আর উদরের ক্ষুধার অনেক প্রভেদ বঝিলি পাগ্লি?'

মল্লিকা তাহার পিতাকে ভাল ক রয়াই চিনে, আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া সহাস্যমুখে ধীরে ধীরে হারমনিয়ামটার কাছে গিয়া বসিল, তাহার পর মধুর কণ্ঠে কয়েক খানি গান গাহিয়া তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

সুরের কি মোহ! আমরা যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটু পরে মল্লিকার পিতাও কি একটা প্রয়োজনে বাহিরে চলিয়া গেলেন

ঘরের ভিতর একা বসিয়া থাকিতে কেমন বিরক্ত বোধ হইতেছিল। কি করিব তাহাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম। সহসা আমার দৃষ্টি পড়িল কতকগুলি বইয়ের উপর।

ভাবিলাম—বাঁচা গেল। পুস্তক পাঠে কিছু সময় কাটান যাইবে হয় তো।

কোন্ বইখানি লইব তাহাই বাছিতেছিলাম। হঠাৎ একখানা বইয়ের ভিতর হইতে একটুকরা কাগজ বাহির হইয়া পড়িল, ভাঁজ্‌টা খুলিয়া ফেলিলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে :—

ভাই সুধা !

আমি যাকে ভালবাসি, তুই তাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলি ; রবিবার তিনি আস্‌বেন এখানে, তুই আসিস্ কিন্তু !

তোর মল্লিকা।

একটা অপরিসীম গর্ব্বে আমার হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। চিঠিখানি ধীরে ধীরে বইয়ের ভিতরে রাখিয়া দিলাম। বুঝিলাম—যে কোন কারণেই হোক্ যাহার জন্য এখানি লেখা হইয়াছিল, তাহাকে ইহা দেওয়া হয় নাই।

বসিয়া বসিয়া অপর একখানি বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলাম, গল্পাংশ কিন্তু কিছুই অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল না, মন পড়িয়াছিল মল্লিকারই উপরে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম করিতেছিলাম, কিছুক্ষণ পর মল্লিকা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। গল্প করিতে করিতে হঠাৎ সে আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—শচীনের কোন চিঠি পত্র পাই কি না ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—'বহুদিন পূর্ব্বে তার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম, সে ভালই আছে।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মল্লিকা পুনরায় বলিল—'আচ্ছা শচীনদা' কেমন লোক ব'লে তোমার মনে হয় ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—মন্দ কি। নিজে ভাল হ'লে, জগতের সকলই ভাল হয়, বুঝলে মল্লিকা ?'

সে বলিল—'তাকে কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগে না, ভারি ছোট মন তার। আমার কাছে সে তোমার নামে এমন বিশ্রী নিন্দে করেছিল !

আমি হাসিয়া বলিলাম 'সে আমি জানি।'

সে অবাক্ বিস্ময়ে বলিল—'কি করে' ? আমি তো তোমাকে তা' বলি নি।'

আমি বলিলাম—'না, তুমি বল নি। আস্‌বার দু'একদিন আগে সে নিজেই বলে' আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।'

এই প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা পড়িা গেল।

তারপর সে বায়না ধরিয়া বসিল—'আজ 'চিত্রায়' কি একখানি ভাল বই আছে। আমায় নিয়ে চল না মণিদা' ?'

আমি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম ; বুঝি সে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল ; বলিল 'মা বাবার অমত হ'বে না ; আচ্ছা' আমি মাকে জিজ্ঞেসা করে আসি।' সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মনে মনে আমি তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রশংসা করিলাম।

একটু পরেই সে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ফিরিয়া আসিল। আনন্দে তাহার সর্ব্বদেহে একটা পুলক-শিহরণ জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—'মা বল্লেন —মণিদা' নিয়ে যাবে, সে তো ভাল কথা, যা না।'

'যাই, আমি তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নি।' বলিয়া সে আর সেখানে অপেক্ষা করিল না।

তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, মল্লিকা সাজগোজ করিয়া আসিয়া বলিল—'আমি প্রস্তুত, তুমি এবার গাড়ী আন্‌তে পার!'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'মাকেও যেতে বল না?'

সে বলিল—'তুমি বল্‌বার আগেই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস্ ক'রেছি, তাঁর অনেক কাজ, তিনি আজ যেতে পার্‌বেন না।'

ট্যাক্‌সি আনিতে আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

দ্বারের কাছে আসিয়া 'হর্ণ' দিতেই মল্লিকা বাহির হইয়া আসিল। ট্যাক্‌সিতে উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মল্লিকাকে আজ বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। চাঁপা ফুলের রঙের একখানি সাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার তনুলতাকে বেষ্টন করিয়াছিল, কি লীলায়িত তাহার চলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা। একপাল চক্ষু যেন তাহাকে একেবারে গিলিয়া খাইতেছিল। লোকগুলির রকম দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছিল, রাগও কম হইতেছিল না। তাহাকে একপাশে দাঁড় করাইয়া আমি প্রথম শ্রেণীর দুইখানি টিকিট লইয়া আসিলাম।

'শো' আরম্ভ হইতে তখনও দেরী ছিল, বইখানি আমার পূর্ব্বেই দেখা বলিয়া, সংক্ষেপে ইহার গল্পাংশ মল্লিকাকে বলিতে লাগিলাম; সে খুব আগ্রহের সহিতই তাহা শুনিতেছিল। গল্প শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 'শো' আরম্ভ হইল, মল্লিকার বুঝিতে আর কোন অসুবিধাই রহিল না।

প্রায় সাড়ে আটটায় 'শো' শেষ হইল। অভিনয় দেখিয়া মল্লিকা খুব খুসী হইয়া বলিল—'ভারি চমৎকার বই।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'বিলেতী ছবির সঙ্গে দেশী ছবির কোন তুলনাই হয় না। কি চমৎকার নিখুঁত অভিনয় বল দেখি ?'

সে বলিল—'তা' সত্যি, তবে আমাদের বাঙলা ছবিরও যে উন্নতি হচ্ছে তা' তোমায় স্বীকার কর্‌তেই হ'বে। 'চণ্ডীদাসই তার প্রমাণ।'

একখানি ট্যাক্‌সিতে দুইজনে উঠিয়া বসিলাম, আঁকিয়া-বাঁকিয়া তীব্রবেগে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।...

মল্লিকাকে বাড়ীতে পৌছছিয়া দিয়া তাহার মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম। তিনি বলিলেন—'মাঝে মাঝে এস' বাবা!'

'আচ্ছা' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। মল্লিকা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিল—'আবার কবে আস্‌ছ মণিদা'।'

'সুবিধা হ'লেই আস্‌ব।' বলিয়া পথে নামিয়া পড়িলাম।

মানুষ যে কত দুর্ব্বল, আজ আমি তাহা স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

—চোদ্দ—

ইতিমধ্যে আর বিনোদদের বাড়ী আমার যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই। বিনোদ সেদিন আমাকে খুব অনুযোগ করিয়া বলিল—'বৌদি'র কড়া হুকুম—তোমাকে যে অবস্থায় পাব, গ্রেপ্তার করে' নিয়ে তাঁর কাছে হাজির করতে হ'বে!'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আমি আত্মসমর্পণ করছি।'

'তা' হলেও ছাড়ান পাবে না' বলিয়া সে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

নাছোড়বান্দা সে, ছুটির পর তাহার সঙ্গে যাইতেই হইল, আমার কোন আপত্তিই তাহার কাছে টিকিল না।

এই কয়দিন বিনোদদের বাড়ী না যাওয়ার জন্য আমি মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

বৌদি'কে কি যে যুক্তিযুক্ত কারণ দেখাইব তাহা ভাবিয়া পাইতে-ছিলাম না।

বিনোদের পড়িবার ঘরে গিয়া বসা গেল।

বিনোদ বলিল—'বোস্ ভাই, আমি এখনই আস্ছি।'

আমি বসিয়া বসিয়া তাহার কবিতার খাতা হইতে কবিতা পড়িতেছিলাম। কিছুদিন হইতে আমি নিজেও কিছু কিছু গল্প কবিতা মক্স করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম—বিনোদের কাছে সে

কথা বলিয়া তাহাকে আমার লেখা দেখাইব কি না, কিন্তু কি জানি কেন বড় লজ্জা করিতেছিল।

একটু পরেই বিনোদ ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে বৌদি।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'নমস্কার বৌদি।'

বৌদি' হাসিয়া জবাব দিলেন—'নমস্কার করলেই কি তোমার শাস্তি কিছু কম হ'বে বলে মনে কর? তুমি যে গুরুতর অপরাধ ক'রেছ তার শাস্তি—সাত দিন সমানে এখানে হাজির হ'তে হ'বে!'

বৌদির কথা বলিবার রকম দেখিয়া আমি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলাম। তারপর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গম্ভীরভাবে করযোড়ে বলিলাম—'হুজুরের শাস্তির পরিমাণটা বড় বেশী হ'য়ে গেল। সাত-দিনের স্থলে শনি-রবি দু'দিন করলে অধীন বাধিত হবে!'

'বেশ' প্রথম অপরাধ বলে' তোমার আর্জি মঞ্জুর করলুম। এখনে থেকে প্রতি শনি-রবিবারে তোমার এখানে হাজির হ'তে হ'বে!' বলিয়া বৌদি' হাসিতে লাগিলেন।

আমি কিন্তু হাসিলাম না, বলিলাম—'এও ঠিক হ'ল না বৌদি'। প্রতি শনি রবিবার কি ক'রে আস্‌ব। ঐ দুটো দিনে যে আমাকে বায়-স্কোপে যেতে হয়। যখন যাব' না মাঝে মাঝে আস্‌ব।

বৌদি' সহাস্য বদনে বলিলেন—'বেশ' তাই এস' ভাই! আমি মনে করলুম তুমি বুঝি আমার সঙ্গে রাগ করে এ' কদিন এখানে আস' নি।''

আমি হাসিয়া বলিলাম—'রাগ করব কেন বৌদি'? আপনার মত স্নেহময়ী-বৌদি'র উপরও রাগ হয় না কি? একটু ব্যস্ত ছিলুম বলে এ, ক'দিন আস্‌তে পারি নি; সে জন্য আমার নিজেরই ভাল লাগ্‌ছিল না।

'তোমরা দু'জনে বসে গল্প কর,' আমি এখনি আস্‌ছি!' বলিয়া বৌদি' চলিয়া গেলেন।

আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম; এ' যাত্রার মত একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিনোদকে আমার গল্প লেখার বলিলাম।

সে খুব উল্লসিত হইয়া বলিল—'চমৎকার! আমাকে এতদিন বল নি কেন মণি?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'বেশীদিন থেকে তো লিখ্‌ছি না, তোমার লেখা দেখে ইচ্ছে হ'ল, তাই একটু চেষ্টা করৃছি মাত্র। ক'দিন থেকে তোমাকে বলৃব বলৃব মনে করৃছি কিন্তু প্রথম লেখা, কিছু হয় নি বলে' কেমন লজ্জা করৃছে।'

তারপর স্থির হইল,—কাল কলেজে তাহাকে আমার লেখা দেখাইতে হইবে।

কিরণ দুই কাপ চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল; পিছন পিছন আসিল বৌদি'। তাঁহার হাতে খাবার বোঝাই দুইখানি ডিস্‌। খাবারগুলি আমাদের সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া 'তোমরা বসে' বসে' খাও ভাই! আমি চট্‌ করে গা ধুয়ে আস্‌ছি।' বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি কিরণকে বলিলাম—'তোমার কাছে আমার কি পাওনা সে কথা মনে আছে তো?'

কিরণ হাসিয়া বলিল—'আছে; আগে খেয়ে নিন্‌, তারপর গান গাইব'খন।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'তা' কেন? গান শুন্‌তে শুন্‌তে খাওয়াটাই তো উপাদেয় হ'বে!'

কিরণ হাসিয়া বলিল—'আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনার খাওয়াটাই হয় তো মাটি হ'য়ে যাবে!'

আমি স্মিতমুখে বলিলাম-'সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার কিরণ! তোমার এ' পেটুক দাদার খাওয়া অত সহজে মাটি হয় না; তোমার গান যদি খারাপও হয়, আমার কাছে ভালই লাগ্‌বে কিরণ, তোমাকে যখন ভাল লেগেছে, তোমার গান কখনও খারাপ্‌ লাগ্‌তে পারে না।'

লজ্জায় তাহার মুখখানি সিঁদুর-রাঙা হইয়া গেল বটে, কিন্তু আনন্দে এবং গর্ব্বে তাহার চোখ দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া সে হারমনিয়ামটার কাছে বসিল, তারপর মধুর স্বরে রবীন্দ্রনাথের সেই পরিচিত গানটী গাহিতে আরম্ভ করিল :—

'দেখা পেলাম ফাল্গুনে।
এতদিন যে বসেছিলাম—
পথ চেয়ে আর কাল গুণে!'

গান শেষ হইলে আমার মুখ দিয়া আপনা হইতে বাহির হইয়া আসিল—'চমৎকার!' সত্যই কিরণের গলা অতি সুন্দর; তাহার গান গাহিবার ভঙ্গিমাটুকু অতি চমৎকার! বেশ একটা শান্ত-স্বচ্ছ ভাব। আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। চট্‌ করিয়া মনে পড়িয়া গেল মল্লিকার কথা। তাহার গলাও মিষ্টি; কিন্তু গান গাহিবার কৌশলটুকু সে কিরণের মত আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হইতেছিল। দুই জনের সঙ্গে তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে, একজন স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ,

আর একজন তীব্র সূর্য্যের তেজ! একজন শীতের স্রোতহীন শান্ত নদী আর একজন বর্ষার দু'কূল-ভাঙা ভীষণ স্রোতস্বিনী।

বিনোদ বলিল—'কই, খাচ্ছ না? কিরণের এই রাবিশ্ গান শুনেই যে তুমি একেবারে তন্ময় হ'য়ে পড়েছ হে?'

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—'না খেয়ে উঠ্ব না, এ অতি সত্য কথা; কিন্তু তুমি কিরণের গানকে রাবিশ্ বল্লে কি করে' বুঝ্তে পার্ছি না বিনোদ!'

বিনোদ মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

খাবারগুলি তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া আমি কিরণকে আরও দুই-একখানি গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম।

সে আর একখানি গান আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভিতর একজন যুবক প্রবেশ করিল; বেশ সুশ্রী গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ্ পরিস্ফুট।

বিনোদ তাহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিল; সেও বিনোদের বন্ধু; সিটী কলেজে আই-এ পড়ে; নাম—ভোলানাথ ভাদুড়ী।

এই নামটী যেন কোথায় দেখিয়াছি, ঠিক্ করিতে পারিতেছিলাম না। সহসা স্মরণ হইল—মামীমার 'কল্লোলিনী' কাগজে ইঁহার গল্প পড়িয়াছি বটে, সেই গল্পটী আমার খুবই ভাল লাগিয়াছিল; তবে ইনিই সেই লেখক কি না জানিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইতেছিল। একটু সঙ্কোচের সহিতই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, আপনি কি মাসিক-পত্রে গল্প লেখেন?'

তিনি হাসিলেন, কি অপূর্ব্ব সেই হাসি!

ইহার জবাব দিল—বিনোদ ; বলিল—'বাঙলা দেশে এমন কোন কাগজ নেই যাতে এ' লেখে নি !'

এতবড় একজন লেখকের সহিত পরিচয় হওয়ায় আমি মনে মনে একটা অপরিসীম গর্ব্ব অনুভব করিলাম। যোড়হস্তে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—'আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপনার লেখা আমার বড় ভাল লাগে।'

তিনি আবার হাসিলেন।

'এই যে ভাদুড়ীমশাই, কখন এলেন ?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৌদি' ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

'এই কিছুক্ষণ হ'ল এসেছি, আজ এসে বড় অসুবিধা করলুম এদের। বেশ গান হচ্ছিল, আমি আসতেই উনি গান বন্ধ করে দিলেন।' বলিয়া হাসিয়া ভোলানাথবাবু কিরণকে দেখাইয়া দিলেন।

কিরণ একটা প্রতিবাদ করিতে যাইয়া রাঙা হইয়া ঘামিয়া উঠিল।

বৌদি' তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বললেন—'যা' ভাই কিরণ, তুই ভাদুড়ীমশায়ের জন্য চা আর খাবার নিয়ে আয়। বাবা ! এই লেখকেদের আমার বড্ড ভয় করে, একটু খুঁত পেলে কি, অমনি গল্প লিখে গালাগালি সুরু করে দিলে !'

'লেখকদের প্রতি এ আপনার বড় অবিচার।' বলিয়া ভোলানাথবাবু হাসিলেন।

আমরাও হাসিয়া উঠিলাম।

ভোলানাথবাবুর জলযোগের পর কিরণকে আর দুই একখানি গান করিতে হইল।

আসিবার সময় বৌদি' আমাকে তাঁহার শাস্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

'সাম্‌নের শনি রবিবারে নিশ্চয় আস্‌ব।' বলিয়া বিদায় লইলাম।

হোষ্টেলে ফিরিতে রাত হইয়া গেল।

—পনের—

হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া সে'দিন আমার নামে একখানি চিঠি ও 'নিয়তি' নামক একখানি সাপ্তাহিক কাগজ পাইলাম। তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সূচীপত্রের দিকে দৃষ্টি ফেলিতেই দেখিলাম—আমার লেখা 'নতুন বৌদি' শীর্ষক গল্পটী ইহাতে ছাপা হইয়াছে। খুসীতে আমার অন্তর ভরিয়া গেল; এই তো সে'দিন লেখা পাঠাইয়াছি, ইহারই মধ্যে এত শীঘ্র কি করিয়া ইহা যে ছাপা হইয়া গেল তাহা ভাবিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। গল্পটী বারবার পড়িয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না; আত্মগৌরবে মনটা আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিনোদের বৌদি'র নিকট যে অসীম স্নেহ পাইয়াছি, তাহারই হুবহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি।

চিঠিখানি লিখিয়াছেন মামীমা, আমার পত্র না পাইয়া তিনি খুব চিন্তিত আছেন; তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে বলিয়াছেন, পরিশেষে জানিতে চাহিয়াছেন যে, মল্লিকাদের বাড়ী গিয়াছিলাম কি না?

হিসাব করিয়া দেখিলাম—সত্যই মামীমার নিকট অনেকদিন চিঠি দেওয়া হয় নাই। কাগজ কলম লইয়া তখনই তাঁহার কাছে পত্র লিখিতে বসিলাম, মল্লিকাদের বাড়ী যে গিয়াছিলাম তাহাও লিখিয়া দিতে ভুলিলাম না।

পরদিন কলেজে বিনোদকে আমার অন্যান্য গল্প কবিতা দেখাইলাম, 'নিয়তির 'গল্পটী কিন্তু দেখাইলাম না, মনে মনে ঠিক্ করিলাম শনিবার যখন তাহাদের বাড়ী যাইব বৌদি'কে একেবারে অবাক্ করিয়া দিতে হইবে।

বিনোদ আমার লেখাগুলি পড়িয়া খুব প্রশংসা করিয়া বলিল—'প্রথম লেখা হিসেবে সত্যি এগুলো খুব ভাল হ'য়েছে।'

আমি উল্লসিত হইয়া উঠিলাম।

ইহার পর নূতন কিছু লিখিলেই দু'জনেই দু'জনকে দেখাইতাম।

আজ শনিবার।

কলেজে বিনোদকে বলিয়া দিলাম—'বাড়ী থাকিস্ ভাই, বিকেলে তোদের ওখানে যাব।'

সে বলিল—'এখনই চল না কেন?'

আমি বলিলাম—'না, অনেক কাজ আছে, বিকেলে নিশ্চয় যাব।'

ছুটীর পর আমি হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম।

এখানকার বন্ধুর দল ধরিয়া বসিল—'চল, বায়স্কোপে যাই, ভাল বই আছে।

অনেকদিন ইহাদের সঙ্গে বায়স্কোপে যাই নাই, কি মনে করিয়াছে, কে জানে?

বিনীতভাবে বলিলাম—'আজ মাপ কর' ভাই, আর একদিন যাওয়া যাওয়া যাবে। এক্ষুণি আমাকে একটু কাজে বেরুতে হ'বে।'

তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতে লাগিল, কি বুঝিল তাহারাই জানে। আমি কিন্তু আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, সোজা আমার 'রুমে' আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

একটু পরেই ভাল সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম, যাইবার সময় কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় হইতে খানকয়েক 'নিয়তি' কিনিয়া লইলাম।...

বিনোদ নীচেই ছিল, আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিল।

সিঁড়িতে কিরণের সঙ্গে দেখা হওয়ায় বলিলাম—'বৌদি'কে নিয়ে শীগ্‌গির ক'রে এস', একটা জিনিস্ এনেছি।'

বিনোদ বলিল—'কি রে মণি?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'বৌদি' না এলে তা' বল্‌ব না।'

কিরণ বলিল—'আমি বৌদিকে নিয়ে এখুনি যাচ্ছি, তোমরা বোস গিয়ে।'

বিনোদের পড়িবার ঘরে গিয়া বসা গেল।

একটু পরেই কিরণের সঙ্গে বৌদি' আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

হাসির প্রস্রবণ ছুটাইয়া বৌদি' বলিলেন—'কি এনেছ, নতুন ঠাকুর পো? কিরণের কাছে শুনেই আমি ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি।'

আমি পকেট হইতে তিনখানি 'নিয়তি' বাহির করিয়া তিনজনের হাতে দিয়া বলিলাম—'আমার প্রথম লেখা আপনাকে নিয়ে লিখেছি বৌদি,' আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন যেন আমার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ না হয়।'

বৌদি'র বিস্ময়ের অবধি রহিল না; তিনি ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—'একজন তো আমার দাঁত নিয়ে কবিতা লিখ্‌লেন, তুমি আবার

কি নিয়ে গল্প লিখ্‌লে? তোমাদের সঙ্গে আমার মেশাই দায় হ'য়ে উঠ্‌ল দেখ্‌ছি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আমি কি নিয়ে গল্প লিখেছি দয়া করে' একবার পড়েই দেখুন না!'

অধর কোণে হাসির রেখা টানিয়া কিরণ বলিল—'যাঁর লেখা তাঁর মুখেই শোনাবে ভাল।'

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বৌদি' বলিলেন—'আমি কিরণের কথাই সমর্থন করছি!'

আমি পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; পকেট হইতে আর একখানি 'নিয়তি' বাহির করিয়া গল্পটী খুঁজিতেছিলাম, সেই মুহূর্ত্তে ঘরে প্রবেশ করিলেন—ভোলানাথবাবু। তাঁহার আগমনে যেমন আনন্দ হইতেছিল, সঙ্কোচও হইতেছিল ঠিক্ তেমনই।

ভোলানাথবাবু আমাকে খুব উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'লজ্জা কি, পড়ুন না!'

আমি সসঙ্কোচে পড়িতে লাগিলাম!

গল্প শেষ হইলে দেখিলাম—বৌদি'র মুখখানি খুসীতে ভরিয়া গিয়াছে; তিনি একেবারে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিরণ বলিল—'মা গো, আপনি যেন কি! যা-যা ঘটেছে এখানে সব লিখেছেন! এমন কি কোথায় কোন্ জিনিসটী আছে তার পর্য্যন্ত হুবহু বর্ণনা!'

বিনোদ বলিল—'সর্ব্বপ্রথম লেখা হিসেবে সত্যি এটী বেশ হ'য়েছে!'

ভোলানাথবাবুর নিকট হইতে কোন মতামত আসিল না, তিনি

হঠাৎ কেমন গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্যের কারণটা আমি ঠিক্ ধরিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সংসারে আত্ম-প্রশংসা শুনিতে কে না চায়? বৌদি' কিংবা কিরণ যে চাহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি!

এখন হইতে আমার আদর-যত্ন যেন একটু বাড়িয়া গেল।

আমারও আনন্দ বড় কম হইতেছিল না! এমন করিয়া যে বৌদি'র স্নেহের বন্ধনে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইয়া যাইব তাহা কে জানিত?

এখন হইতে সুযোগ পাইলেই ভোলানাথবাবু আমার সঙ্গে ঠাট্টা-বদ্রূপ করিতে ছাড়িতেন না।

আসিবার সময় বৌদি' স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন—'স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কাল আবার এস'।'

আমি মৃদু হাসিয়া সম্মতি জানাইলাম।

আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া সেদিন হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম।...

কয়দিন হইতে মল্লিকার জন্য প্রাণটা কেমন করিতেছিল; অথচ এই সপ্তাহে তাহাদের ওখানে যাইবার কোন সুবিধাই করিয়া উঠিতে পারিলাম না; মনে মনে স্থির করিলাম— যেমন করিয়াই হউক, আগামী সপ্তাহে নিশ্চয়ই তাহাদের ওখানে যাইব।

পরদিন খুব সকালে উঠিয়া কিরণের জন্য একটী কবিতা লিখিতে বসিলাম। একটু চেষ্টা করিতেই ছোট একটী গীতি-কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কবিতাটী পড়িয়া নিজেরই খুব আনন্দ হইতেছিল। কিরণও নিশ্চয়ই খুসী হইবে ভাবিয়া আমি পুলকিত হইয়া উঠিলাম!

নারীর রূপ

বিকালের দিকে আজ একটু সকাল করিয়াই বিনোদদের বাড়ী গিয়াছিলাম।

ভোলানাথবাবু আমার পূর্ব্বেই আসিয়াছেন, সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিলেন—'আসুন কবি।'

আমিও হাসিয়াই তাঁহাকে নমস্কার জানাইলাম, কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনার মধ্যে ব্যঙ্গ মিশ্রিত ছিল কি না ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ঘরে সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

আমি কিরণের দিকে চাহিয়া বলিলাম—'তোমার জন্য একটা গীতি-কবিতা লিখেছি, সুর দিয়ে গাইতে হ'বে কিন্তু তোমায়!'

কিরণের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমার কাছে উঠিয়া আসিয়া বেশ একটু আগ্রহের সহিত বলিল—'কই দেখি কি লিখেছেন?'

আমি কবিতাটী বাহির করিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম, সে মনে মনে উহা পাঠ করিয়া খুব পুলকিত হইয়া উঠিল।

ভোলানাথবাবু আড়-চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কি লিখ্লে, একটু জোরেই পড় না? আমরাও শুনি।'

ফাগমাখা মুখে কিরণ পড়িতে লাগিল—

তোমার মধু-অমিয় গানে,
কতই হরষ জাগায় প্রাণে;
মনের আঁধার দূর হ'য়ে যায়
কিরণ-ঢালা আলোর বানে।

স্বপন-ঘোরে ফুটাই নিতি,
হৃদ্-কাননের পুষ্প-বীথি

কেমন করে' ভুলব বলো ?
নিত্য তোমার অসীম প্রীতি !

কি সুর বাজে তোমার গানে
জানে, আমার মন তা' জানে ;
মাতাল-সম যাই গো ছুটে,
পুলক-ভরা স্নেহের টানে ।

বৌদি' খুব খুসী হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'বাঃ' নূতন ঠাকুরপো, ভারি চমৎকার হ'য়েছে তো !'

বিনোদ তাঁহাকে সমর্থন করিল।

কিরণ বলিল—'এবার মাষ্টার মশাই যেদিন আস্‌বেন তাঁর কাছ থেকে এ' গানটার সুর করে নিতে হ'বে।"

ভোলানাথবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'আজ চল্‌লুম বৌদি,' আমায় আবার এক্ষুণি একটা মিটিংএ যেতে হ'বে।'

বৌদি' বলিলেন—'আপনার ক্ষতি করে ধরে রাখতে চাই না। আবার কবে আস্‌ছেন বলুন ?'

ভোলানাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এবার আসতে হয় তো দু'চার দিন দেরী হ'বে বৌদি, ভারি চমৎকার একটা প্লট মাথায় এসে গেছে, গল্পটা 'ফিনিস্‌' না ক'রে আস্‌তে পারব না কিন্তু।'

ভোলানাথবাবু চলিয়া যাইবার পর কিরণের কয়েকখানি গান শুনিয়া সেদিন আমিও সকাল সকাল উঠিয়া পড়িলাম।

—ষোল—

শনিবার দিন হোষ্টেলের বন্ধুদের সঙ্গে 'মন্ত্রশক্তি' দেখিতে গিয়াছিলাম, কাজেই সেদিন আর আমার মল্লিকাদের বাড়ী যাওয়া হইয়া উঠিল না।

রবিবার খাওয়া দাওয়ার পর মল্লিকাদের ওখানে যাইব বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

মল্লিকা চকোলেট্ খুব ভালবাসে। যাইবার সময় তাহার জন্য এক বাক্স চকোলেট্ কিনিয়া নিলাম।

মল্লিকার বাবা বাহিরের ঘরেই ছিলেন, নমস্কার করিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম।

তিনি খুব খুসী হইলেন; এতদিন না আসিবার জন্য ব্যগ্রভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমার শারীরিক কুশলবার্ত্তা জানিতে চাহিলেন।

না আসিবার একটা বাজে কারণ দেখাইয়া, শারীরিক ভাল আছি জানাইয়া আমি একটু মৃদু হাসিলাম।

উপরের ঘর হইতে অর্গ্যানের মিষ্ট বাজনা এবং মল্লিকার গানের দু'একটা কলি ভাসিয়া আসিতেছিল, আমার মন পড়িয়াছিল সেইখানেই। মল্লিকাসম্বন্ধে আমি মনে মনে কত জল্পনা-কল্পনাই না করিতেছিলাম।

মল্লিকার বাবার কথা আর ফুরাইতে চাহে না।

আমি মনে মনে বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছিলাম।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়াই হয় তো এক সময়ে তিনি বলিয়া বসিলেন—'চল, উপরে যাওয়া যাক্। আমার এক বন্ধুর ছেলে পলাশ এসেছে, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিগে। ভারি চমৎকার ছেলে হে। বি-এ পাশ করে ইংরেজীতে এম-এ পড়ছে।'

কি আর বলিব? একটু হাসিয়া তাঁহার পিছন পিছন উপরে চলিলাম। একটা অজানিত আশঙ্কায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম, কে যেন আমার মনের কোণে একটা চাবুক লাগাইয়া গেল।

মল্লিকার মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি জোর করিয়া হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'এস' বাবা বোস'!'

মল্লিকার গান বন্ধ হইয়া গেল, নিমিষে তাহার মুখখানি কি জানি কেন মলিন হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল—'এস' মণিদা'।' তাহার এ আহ্বান আমার কাছে যেন আজ প্রাণহীন বলিয়া মনে হইল।

তাহার পাশেই একখানি চেয়ারে একজন সুশ্রী যুবক বসিয়াছিল, বুঝিলাম ইহারই নাম পলাশ। সে তাহার চশমার ভিতর দিয়া একবার আমাকে দেখিয়া লইল।

মল্লিকার হাতে চকোলেটের বাক্সটা দিয়া তাহার পাশের খালি চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলাম।

মল্লিকা বাক্সটা একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া অর্গ্যানের উপর রাখিয়া দিল।

ইতঃপূর্ব্বেও মল্লিকাকে আমি চকোলেট দিয়াছি, তখন সে কত খুসী হইয়াছে; আজ কিন্তু খুসীর কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

হায় রে নারীর মন!

এরূপভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আমার কেমন বিশ্রী ঠেকিতেছিল; তাই ব্যাপারটাকে সহজ করিবার জন্য আমি হাসিয়া বলিলাম—'বাঃ বসে রইলে যে, গান গাও!'

পলাশও হাসিয়া আমার কথা সমর্থন করিল।

মল্লিকার বাবা বাহিরে মল্লিকার মায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাসিতে ঘরের থম্‌থমে ভাবটা একেবারে দূর করিয়াদিলেন। পলাশের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিয়া মল্লিকাকে তিনি নিজেই গান করিতে বলিলেন।

মল্লিকা গান গাহিল বটে, তাহার গান কিন্তু আজ আর তেমন জমিল না।

একটু পরে মল্লিকার মা আমাদের চা এবং জলখাবার দিয়া গেলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে হইল।

ভিতরে ভিতরে আমার মনটা কিন্তু বিষাইয়া উঠিতেছিল। স্পষ্ট অনুভব করিলাম—আমার আসা আজ এঁরা আশা করেন নাই, তাই পছন্দও করিলেন না।

পাঁচটা বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বাকী ছিল।

পলাশ ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল; মল্লিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল 'আমরা তো আজ বায়স্কোপে যাচ্ছি, চলো না মণিদা,' আমাদের সঙ্গে?'

আমি একটু গম্ভীরস্বরে বলিলাম—'না, তোমরা যাও, আজ আমার একটু কাজ আছে, এখনই উঠ্‌তে হ'বে।'

মল্লিকা আর অনুরোধ করিল না, আমার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পলাশ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া 'গীতাঞ্জলি'র পাতা উল্টাইতে লাগিল।

একটু পরেই সে উঠিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিলাম।

মল্লিকা আস্‌মানী রঙের একখানি সাড়ী পরিয়াছিল; তাহাকে বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। বার্ণিজ-শ্লিপার পায়ে পরিয়া, আমার মুখের কাছে তাহার কাপড়ের আঁচলটা দোলাইয়া দিয়া পলাশের সঙ্গে ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিল।

বিজয়-গর্ব্বে পলাশের বুক ফুলিয়া উঠিল। ঘাড় কাৎ করিয়া মল্লিকা একবার আমার দিকে চাহিল; তাহার অধর-কোণে চপল হাসি।

একটা অসহনীয় বেদনায় আমার বুকটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না; পা দু'টাকে ধীরে ধীরে চালাইয়া দিলাম। সারা পথ শুধু ভাবিতেছিলাম--এত প্রেম, ভালবাসা সবই কি মেকী!

হায় রে ছলনাময়ী নারী!

—সতের—

একটা দারুণ ঘৃণায় মল্লিকার উপর আমার মনটা একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ এত নীচ হইতে পারে? হইতে পারে পলাশ রূপবান্, বিদ্বান্, তাই বলিয়া আমাকে এমন তাচ্ছিল্য করিবার কি আছে? বিশেষতঃ মল্লিকা যখন আমার সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে সে আমাকে ভালবাসে। তাহারই একখানি পত্রে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—এই বুঝি তাহার ভালবাসার রীতি? দারুণ আক্রোশে আমি মনে মনে ফুলিতেছিলাম। আমার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িয়াছিল মল্লিকার উপরে। তাহার পিতামাতা হয় তো পলাশের রূপ-গুণ দেখিয়া ভুলিতে পারেন, কিন্তু সে নিজে ভুলিল কি করিয়া? পলাশ আমা অপেক্ষা কি এমন বেশী সুন্দর? এমন বিদ্বান্ই বা কি? বি-এ পাশ করিয়াছে বই তো নয়? আমিও তো পড়িতেছি; আমার ভবিষ্যৎ তো পলাশের অপেক্ষাও উজ্জ্বল হইতে পারে! তবে সে আমাকে এমন করিয়া অপমান করিল কেন? ভালবাসার এমন অভিনয়ই বা করিল কেন?

অন্তর-যুদ্ধে আমি একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিলাম।

মনটা আমার একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল।

এই কয়দিন আর কোথাও বাহির হই নাই; বিনোদ বহুবার

অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাহাদের বাড়ী যাই নাই। শরীর অসুস্থ বলিয়া মিথ্যা অজুহাতে তাহাকে ফাঁকি দিয়াছি। একা থাকিতেই কেমন ভাল লাগিতেছিল।

কয়দিন পরেই কিন্তু মনের রাগটা অনেকটা কমিয়া গেল। নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগিতেছিল না। এ'কয়দিন বিনোদদের ওখানে না যাইবার সত্যই কোন হেতু ছিল না; এক জায়গায় আঘাত পাইয়াছি বলিয়াই যে, আর এক স্থানে আঘাত পাইতে হইবে তাহারও তো কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না।

* * *

সে'দিন বিকালের দিকে বেড়াইতে বেড়াইতে বিনোদদের বাড়ী গিয়া হাজির হইলাম।

এতদিন না যাওয়ার জন্য বৌদি' অভিযোগ করলেন, কিরণ অভিমান ভরে একপাশে চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল; আমার সঙ্গে কথাই কহিল না। কিরণের রকম দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইতেছিল; বৌদি'র দিকে চাহিয়া বলিলাম—'কিরণ কি আজ কথা না কওয়ার ব্রত ক'রেছে বৌদি'?'

বৌদি' ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—'তা' কি কর্‌বে ভাই, তোমার সেই গানটায় কত ক'রে সুর দিয়ে ঠিক্ করে' রাখলে, তুমি এলে তোমাকে শোনাবে, তা এ' ক'দিনের মধ্যে তোমার আর সময়ই হ'ল' না। নাও, এখন 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলে সেধে রাধার মান ভাঙ্গাও গিয়ে!"

কিরণ ওপাশ হইতে ফোঁস্ করিয়া উঠিল; বলিল—'থাক, আমাকে

কারও সাধতে হবে না। ভারি তো গান ও আর আমার গেয়ে কাজ নেই।’

আমি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম—‘রাগ করো না কিরণ; সত্যি শরীরটা ভাল ছিল না, তাই আস্‌তে পারি নি!’

কিরণের দিক্ হইতে কোন উত্তর আসিল না।

বৌদি’ বলিলেন—‘সত্যি, এ’কদিনে তোমার শরীরটা বড় খারাপ হ’য়ে গেছে নতুন-ঠাকুরপো! কি অসুখ হয়েছিল?’

আমি হাসিয়া বলিলাম—‘মেণ্টাল্ ডিজিজ্।’

বৌদি’ও হাসিয়া উঠিলেন।

একটু পরে বৌদি’ উঠিয়া গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে কিরণও উঠিল।

বিনোদের সঙ্গে তাহার লেখা লইয়া আলোচনা হইতেছিল; সে লিখিতেছিল প্রচুর, অথচ ছাপিবার কোন মোহই তার ছিল না। সে বলিল—‘যা, লিখ্‌ব, তাই যে প্রকাশ কর্‌তে হবে, তার কি মানে আছে মণি?”

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—‘তোমার মত সমস্ত লেখকেরই যদি এই অভিমত হয়, তবে তো পাঠক বেচারীরা মারা যায়; তাদের মনের খোরাক যোগাবে কে?”

বিনোদ হাসিল, লেখা প্রকাশ করিবার কোন আগ্রহই সে দেখাইল না। অনেক করিয়া বলায় সে বলিল—‘দেখা যাবে’খন।’

ঘরে প্রবেশ করিলেন বৌদি’ এবং কিরণ; তাঁহাদের হাতে খাবার ও চা। কিরণ আমার সম্মুখে খাবার এবং চায়ের কাপ নামাইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমি না দেখার ভাণ করিয়া অন্য দিকে মুখ

করিয়া বসিলাম। বৌদি' আমার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

কিরণ বলিল – 'খান, চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।'

বৌদি' সহাস্য-বদনে বলিলেন—'অত সহজেই কি আর খাবে' আগে ঠাকুরপোর রাগ ভাঙা!'

আমি ঠোঁট দিয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া গেলাম।

কিরণ হাসিয়া বলিল—'বাঃ রে, দোষও করলেন নিজে, আবার উল্টো রাগও করা হচ্ছে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'সেই গানখানা গাইলেই আর রাগ করব না!'

ঘরের সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

কিরণ ধীরে ধীরে হারমনিয়ামটার কাছে গিয়া বসিল।

সিঙ্গাড়াটা হাতে লইয়া বলিলাম—'তোমার গান সুরু হলেই আমি খাওয়া আরম্ভ করে দেব।'

সে মৃদু হাসিয়া মধুর কণ্ঠে তাহাকে যে গানটী লিখিয়া দিয়াছিলাম, সেটী গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তানলয়-সংযোগে গানটী হইয়াছিল অপূর্ব্ব; আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলাম—'চমৎকার!'

বৌদি' হাসিয়া বলিলেন—'খাসা গান লিখেছ ঠাকুরপো।'

আত্ম-গর্ব্বে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

রাত হইয়াছিল; বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

শনিবার দিন আসিবার জন্য বৌদি' বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

—আঠার—

মনে করিয়াছিলাম—মল্লিকার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিব, তাহার কথা আর ভাবিব না। কিন্তু পারি কই? অনবরতই তাহার স্মৃতি আমার মানস-পটে জাগিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তোলে। ভাবিতে চাই কিরণকে, কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে মনোদর্পণে মল্লিকার মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। কেন এমন হয় কে জানে?

সে'দিন কিরণের কথাই ভাবিতেছিলাম; সেও মল্লিকার মতই ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া মান-অভিমানের পালা সুরু করিয়াছিল, মনে মনে ঠিক্ করিলাম—অত সহজে আর নিজেকে ধরা দিব না। লোকে দেখিয়া শিখে, আমি কি ঠেকিয়াও শিখিব না?

শনিবার বিকালের দিকে বিনোদদের বাড়ী যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম।

কলেজষ্ট্রীটের মোড়ে আসিতেই আমার সম্মুখ দিয়া একখানি ট্যাক্সি দ্রুত ছুটিয়া গেল; তাহাতে বসিয়া আছে মল্লিকা এবং তাহার পাশে পলাশ। পলাশ আমাকে দেখিতে পায় নাই, মল্লিকা দেখিয়াছে এবং হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া কি বলিল; অনুমানে বুঝিলাম, তাহাদের বাড়ী যাইতে বলিয়া গেল। তাহার চোখে-মুখে একটা আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি!

কে যেন সজোরে আমার বুকে একটা হাতুড়ির আঘাত করিল। একদৃষ্টে তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া নিষ্ফল-আক্রোশে ফুলিতে লাগিলাম।...

বাস আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহাতে উঠিয়া বসিলাম।

হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হইয়া পড়িল; একবার ভাবিলাম, বিনোদদের বাড়ী আজ আর গিয়া কাজ নাই, পর মুহূর্ত্তেই মনে পড়িল বৌদি'র কথা। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই!

বিনোদদের বাড়ী যাইতেই, চাকর আমাকে উপরে লইয়া গেল।

বিনোদের ঘরে বিরাট সভা বসিয়াছে; ভোলানাথবাবু অনেক পূর্ব্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। আমাকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন—'আসুন কবি, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি!'

বৌদি' বলিলেন—'এস' ঠাকুরপো, এত দেরী হ'ল যে?'

সঙ্কোচের সহিত একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলাম—'একটু কাজ ছিল, তাই দেরী হ'য়ে গেল বৌদি'!'

আজ ভোলানাথবাবুকে খুব খুসী বলিয়া মনে হইল; তাঁহার মুখখানি বেশ হাসি-হাসি।

বিনোদ বলিল—'ও হে, ভাদুড়ী একটা গল্প লিখেছে, তোমার জন্য এখনও পড়া হয় নি; এ'বার আরম্ভ করে' দিক্।'

'নিশ্চয়' বলিয়া আগ্রহ-ভরা-দৃষ্টিতে আমি ভোলানাথবাবুর মুখের দিকে চাহিলাম।

বৌদি' হাসিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ, গল্পটাই আগে শোনা যাক্, চায়ের যোগাড় পরে করব' খন্!'

সকলে বেশ মনোযোগ সহকারে স্থির হইয়া বসিল।

ভোলানাথবাবু রুমাল দিয়া মুখখানি মুছিয়া লইয়া পকেট হইতে গল্প বাহির করিয়া হাসি-হাসি মুখে পড়িতে লাগিলেন; তাঁহার পাঠের ভঙ্গিমাটী বড় সুন্দর।

সকলেই বেশ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল।

খানিকটা পড়িতেই তাহার গল্পের ইঙ্গিতটুকু সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভোলানাথবাবু আমাকে লইয়াই এই গল্প রচনা করিয়াছেন। প্রথমটায় সকলেই খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু গল্পের ক্রমঃবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মুখই গম্ভীর হইয়া উঠিল; বিশেষ করিয়া আমার ও কিরণের। লজ্জায় এবং ক্রোধে আমার মুখখানি একেবারে টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিল। ইচ্ছে হইতেছিল লেখাটা কাড়িয়া নিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। আমাকে এত হীন করিয়া আঁকিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারিলাম না।

আমি আর কিরণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম।

'বৌদি' মাঝে মাঝে দু'টো একটা কথা বলিতেছিলেন।

বিনোদ হাসিয়া বলিল—'লেখা তোমার চমৎকার হ'য়েছে ভাদুড়ী কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের মাত্রা একটু বেড়ে গেছে।'

ভোলানাথবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন—'এ্যাটাক্ মনে করছ কেন ভাই, গল্প ইজ্ গল্প।'

ইহার জবাব দিলেন 'বৌদি'; তিনি বলিলেন—'এ' আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু! আপনি তো নূতন-ঠাকুরপোকে আক্রমণ করেই এ' গল্প

লিখেছেন। এত মিথ্যা কথাও লিখ্‌তে পারেন? ঠাকুরপো আবার এখানে প্রেম করলে কবে?' তারপর কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'কি লো, তোর কাছে প্রেম-পত্র দিয়েছে না কি?'

লজ্জায় কিরণের মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল।

ভোলানাথবাবুর মুখে বিজয়গর্ব্বের একটা বিকট হাসি।

সমস্ত ঘরটায় কেমন একটা থম-থমে ভাব!

আমি বলিলাম—'এর পর আর এখানে আমার আসা চলে না বৌদি!

'বৌদি' বলিলেন—'সে কি ভাই? তুমি আস্‌বে না কেন? যা' লিখেছে সবই তো মিথ্যে, এতে তো আর সত্য কিছু নেই!'

কিরণ ধরা গলায় উত্তর দিল—'কে বল্‌লে এতে সত্য কিছু নেই বৌদি'? মণিদা' আমাকে কবিতা লিখে দিয়েছেন, হয় তো আমাকে স্নেহ করেন বলেই; আর তাকে এমন বিকৃত করে উনি লিখলেন গল্প।' তারপর আমার দিকে ফিরিয়া কিরণ বলিল—'তুমি আস্‌বে না কেন দাদা? বলুক না যার যা' খুসী। তোমায় আস্‌তেই হ'বে!'

ভোলানাথবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ইহার আর কি জবাব দিব? আমি চুপ্‌ করিয়া রহিলাম।

*　　　*　　　*　　　*

বৌদি' সে'দিন খাওয়ার আয়োজন করিয়াছিয়েন প্রচুর। আমার কিন্তু খাইবার আর রুচি ছিল না, দারুণ আঘাতে অন্তর-বেদনায় আমি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলাম। নেহাৎ লজ্জার খাতিরেই আমাকে বসিতে হইল।

আসিবার সময় বৌদি' এবং কিরণ আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়া দিল, আমি যেন আবার তাহাদের ওখানে যাই।

উপায় কি, আমাকে সম্মতি দিতে হইল।

আমি ফিরিলাম, পরাজয়ের দারুণ গ্লানি লইয়া; আর ভোলানাথ-বাবু চলিলেন, জয়ের মুকুট মাথায় পরিয়া বুকভরা আশা এবং আনন্দ লইয়া।

সারা পথ মাতালের মত টলিতে টলিতে হোষ্টেলে আসিয়া পৌঁছিলাম।

খাইবার আর প্রবৃত্তি ছিল না, ঠাকুরকে বলিয়া দিলাম—শরীর অসুস্থ। তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িলাম।

চোখে নিদ্রা নাই।

শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম,—ইহার পর আর কিরণদের সঙ্গে মেশা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না, তবে চট্ করিয়া যাওয়াটা বন্ধ করাও উচিত নয়, দেখিতে কেমন বিসদৃশ লাগিবে! ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেই চলিবে।

যাহা হউক একটা ভাবনা কাটিয়া গেল।

চিন্তা-সাগরে কূল পাইয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

একটু চিন্তা করিতেই ভোলানাথবাবুর চক্রান্তটা ঠিক্ ঠিক্ ধরিয়া ফেলিলাম। আমাকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে হেয় করিয়া, নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কি জঘন্য ছলনা!

ঘৃণায় আমার শরীরটা রি-রি করিয়া উঠিল।

—উনিশ—

সেদিন আবার গিয়াছিলাম বিনোদের বাড়ীতে।

ঐ রকম একটা অপ্রিয় ঘটনার পর আজ আমার কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। আমার অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াই হয় তো বৌদি' ব্যাপারটাকে সহজ করিবার জন্য বিশেষ করিয়াই আমার আদর-যত্ন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি কথাতেই উঠিতেছিল একটা হাসির উচ্ছল তরঙ্গ। কিরণকে কি জানি কেন একটু বিমর্ষ বলিয়া মনে হইল; সে ও হাসিতেছিল, কিন্তু তাহার হাসি যেন প্রাণহীন; গান গাহিল বটে, তাহাতেও যেন আর সে' মাদকতা নাই।

আমি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম।

হঠাৎ তাহার আবার কি হইল? ব্যাপারটা ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনের ভিতর কেমন একটা সন্দেহের কাঁটা ফুটিয়া খচ্-খচ্ করিতেছিল।

বিনোদ বাড়ী ছিল না, একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে ভোলানাথবাবু।

ভোলানাথবাবুকে আজ খুব প্রফুল্ল দেখিলাম; হাসিয়া বেশ সহজ-ভাবেই তিনি কথা কহিতেছিলেন। সে'দিন কিরণ তাঁহার গল্প শুনিয়া বেশ চটিয়া গিয়াছিল; আজ কিন্তু তাঁহার উপর কিরণের রাগের কোন

লক্ষণই প্রকাশ পাইল না, খুব ঘনিষ্ঠভাবেই তাঁহার সহিত মিশিয়া হাসিয়া একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

আমার মনে হইল—বুঝি কিরণ তাহার ঐ মিথ্যা গল্পটাকেই সত্য ভাবিয়া আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে। নহিলে, সে আমার কাছেই বা বিমর্ষ হইয়া থাকিবে কেন, আর ভোলানাথবাবুকে দেখিয়াই বা এত আনন্দিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে? বুঝিলাম—'রি-এ্যাকসন্ আরম্ভ হইয়াছে।

ভোলানাথবাবুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের এমন একটা তীব্র আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহাদ্বারা সে ধীরে ধীরে সকলকেই তাহার দিকে টানিয়া লইতে-ছিল! বুঝিলাম—এখানে আমার আর স্থান নাই; যেখানে একদিন বিজয়ী বীরের মত সসম্মানে অবস্থান করিতে ছিলাম, সেখানে হতাদরে করুণার পাত্র হইয়া থাকিতে আমার মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

আমি বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

বৌদি' অবাক্-বিস্ময়ে বলিলেন—'সে কি নতুন ঠাকুরপো, আজ এরি মধ্যে উঠলে যে?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'একটু কাজ আছে বৌদি'! আমার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসবে, সে কথা আমার মনেই ছিল না।'

বৌদি' বলিলেন—'আবার কবে আসছ ভাই?'

'এলেই হ'ল একদিন' বলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কিরণ একবার আমার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

*　*　*　*　*　*

বাহিরে আসিয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম! তাড়াতাড়ি অলস পা দুইটা চালাইয়া দিলাম।

বাসে উঠিয়া বসিলাম।...

সহসা মল্লিকার বাবার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

এতদিন তাঁহাদের ওখানে যাই নাই বলিয়া তিনি অনেক অনুযোগ করিলেন; তারপর ধরিয়া বসিলেন—তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে।

অনেক আপত্তি করিলাম, অনেক অজুহাতও দেখাইলাম, এমন কি, আর একদিন যাইতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। তাঁহার স্নেহের আহ্বানের কাছে আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল: তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, তাঁহার সঙ্গে যাইতেই হইল।

তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, কি প্রশান্ত সে হাসি। ভুলিয়া গেলাম—অতীতের সমস্ত অভিমান!

সমস্ত পথ তিনি আমার সঙ্গে অনেক কথাই বলিলেন; আমাকেও মাঝে মাঝে আলোচনায় যোগ দিতে হইতেছিল।

যতই মল্লিকাদের বাড়ীর নিকটে যাইতেছিলাম, ততই যেন আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিসের যে এ' লজ্জা তাহা কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না।

দ্বারের কাছে আসিয়াই মল্লিকার বাবা চীৎকার করিয়া বলিলেন—'ওগো, কাকে ধরে এনেছি, দেখ্‌বে এস!'

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মল্লিকার মা বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর

আমাকে দেখিয়া খুব উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—'এস,' বাবা এস,' এতদিন আস'নি কেন? কোন অসুখ করে নি তো?'

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—'না, অসুখ করে নি, সময় পাই নি বলে, আসা হ'য়ে ওঠে নি।'

তিনি খাবার ও চায়ের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেলেন।

আমি মল্লিকার বাবার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম।

কেমন একটু অ-স্বোয়াস্তি বোধ করিতেছিলাম।

ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিলাম; চঞ্চল-চক্ষু যেন কাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল, অথচ মুখ ফুটিয়া আমি মল্লিকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না। অনুমানে বুঝিলাম—মল্লিকা নিশ্চয়ই বাড়ী নাই, থাকিলে এতক্ষণে তাহার দেখা একবার হয় তো পাইতাম। মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মল্লিকার বাবা হয় তো আমার মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; তিনি হাসিয়া বলিলেন—'এবার মল্লিকাদের আস্‌বার সময় হ'য়েছে, সে পলাশের সঙ্গে বায়স্কোপে গেছে।'

আমি হাসিয়া একবার দেয়ালের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম আটটা বাজিয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলাম তাহারা আসিবার আগেই উঠি, কিন্তু মল্লিকাকে দেখার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমাকে থাকিতেই হইল!

মল্লিকার পিতা এ'কথা সে' কথার পর্ বলিতে আরম্ভ করিলেন—'পলাশের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ের কথা একরকম পাকাপাকি হ'য়ে গেছে। দু'জনে মিলেছেও চমৎকার; পলাশের পরিচয় তো তোমাকে আগেই

দিয়েছি, ছেলে খুব ভাল, তা' ছাড়া টাকা-পয়সাও খুব বেশী লাগ্‌বে না!'

আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, জোর করিয়া অধর-কোণে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলাম—'পলাশবাবু ছেলে সত্যি খুব ভাল; সব দিক্‌ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে আজকাল এ'রকম একটী ছেলে, এত সহজে পাওয়া খুব দুর্ঘট।

খুসীতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। বলিলেন—'ঠিক্‌ বলেছ তুমি। বিশেষতঃ দু'জনে যখন এত ভালবাসা জন্মে গেছে। কি বল?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'নিশ্চয়!'

* * *

কি একটা প্রয়োজনে তিনি উঠিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন।

একটু পরেই হঠাৎ আমার কানে দুই-একটা কথা প্রবেশ করিল। মল্লিকার মা বলিতেছেন—'তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? মণিকে এ' সংবাদটা এখন না দিলেই কি চল্‌ছিল না? কোথায় কি তার ঠিক্‌ নেই! শেষ পর্য্যন্ত যদি পলাশের সঙ্গে ওর বিয়ে না হয়!'

তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যে বলিলেন—ঠিক্‌ বুঝিতে পারিলাম না। মল্লিকার মা কিন্তু আপন মনেই গজ্‌ গজ্‌ করিতে লাগিলেন।

অন্তরের দারুণ ব্যাথার মধ্যেও আমি হাসি গোপন করিতে পারিলাম না, আপন মনেই হাসিয়া উঠিলাম। হায় রে ছলনাময়ী নারী! সমস্ত স্ত্রীজাতিকেই কি বিধি এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন!

মল্লিকার বাবা হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম—'আজ যাই, আর এক-দিন আস্‌ব খন।'

তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দ্বারের কাছে মটরের 'হর্ণ্‌' বাজিয়া উঠিল। তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—'ঐ ওরা এল' বুঝি!'

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার গলার আওয়াজ শোনা গেল, সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; পিছন পিছন আসিল পলাশ।

'আসুন পলাশবাবু, বসুন।' বলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম।

সে ও প্রতি-নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। এমন অসময়ে সে আমাকে আশা করে নাই বলিয়াই বোধ হয় তাহার এই বিরক্তি।

মল্লিকা বলিল 'কখন এলে মণিদা'? তুমি যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে? এ' দিক্ আর মাড়াতেই চাও না!'

উত্তর দিলেন তাহার বাবা; বলিলেন—'তোদের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য মণি আজ অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছে।'

আমার অন্তর বলিল—'হায়, যদি তোমায় ভুলিতে পারিতাম!' হাসিয়া বলিলাম—'সময় পাই না, কি কর্‌ব বল?'

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজে, আমি বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মল্লিকা বলিল—'আবার কবে আস্‌ছ বল?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'সময় পেলেই একদিন আসা যাবে খন।'

মল্লিকার মা বলিলেন—'তুমি তো আমাদের পর নও, মাঝে মাঝে এস' বাবা।'

নারীর রূপ

'আচ্ছা' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কি জানি কেন মল্লিকাকে যেন আজ বড় সুন্দর দেখিলাম। অতীতের কত কথাই মনে পড়িতেছিল। সমস্ত পথটাই উদ্‌ভ্রান্তের মত চলিয়া আসিলাম।

এত ভালবাসা, এত যত্ন সবই কি মিথ্যা, মেকী!

নারীকে দেবতারাই ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, ক্ষুদ্র মানব তো কোন্ ছার!

—কুড়ি—

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। কয়দিন হইতেই বাড়ীর জন্য মনটা কেমন ছট্‌ফট্ করিতেছিল; স্নেহময়ী মামীমার শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তিখানি মানস-চক্ষুতে ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

মানুষ যখন একজনের কাছ হইতে আঘাত পাইতে থাকে, তখনই সে আরএকজনকে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। নহিলে আমিই বা মামীমার জন্য হঠাৎ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিব কেন?

যে'দিন কলেজ বন্ধ হইল, সে'দিনই আমি বাড়ী রওনা হইলাম। যাইবার পূর্ব্বে মল্লিকা কিংবা কিরণদের সঙ্গে দেখা করি নাই; ইচ্ছা করিয়াই দেখা করি নাই; সমস্ত অন্তরটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছিল।

ট্রেণে উঠিয়া কিন্তু মনটা কেমন করিতেছিল; মনে হইতেছিল—কাজটা ভাল হইল না, দেখা করিয়া আসিলেই বা কি ক্ষতি ছিল।

* * *

বাড়ী আসিয়া মামীমার স্নেহ-শীতল-বক্ষে আশ্রয় লইয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এতদিন অদর্শনের পর আমাকে পাইয়া মামীমা আর ছাড়িতেই চান না। খুঁটিয়া খুঁটিয়া কলিকাতার প্রত্যেকটী কথা

তিনি আমার নিকট হইতে জানিয়া লইলেন। মল্লিকাদের কথা উঠিতেই, আমি পলাশের কথা বলিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, মল্লিকার সম্বন্ধ তাহার সঙ্গে পাকা-পাকি হইয়া গিয়াছে।

মামীমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি আমার দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—'সে কি রে মণি? ওর মা যে, তোর সঙ্গে বে' দেবার জন্য আমায় বলে গিয়েছিল।' তারপর অভিমান-ভরা কণ্ঠে বেশ একটু জোরের সহিতই বলিলেন—'দিক্ না বিয়ে, বয়ে গেল। দেশে যেন মেয়ের অভাব হ'য়েছে? দেখ্ না তোর জন্য আমি কেমন সুন্দরী বউ আনি!'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'এ' তোমার অন্যায় রাগ মামীমা; তারা যদি আমার চেয়ে ভাল ছেলে পায় তবে কি সেখানে মেয়ের বিয়ে দেবে না?'

'তোর চেয়ে ভাল ছেলে, বল্লেই হ'ল!' বলিয়া মামীমা আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিলেন।

* * *

আমার অভাবে মামীমার স্নেহের খানিকটা গিয়া পড়িয়াছিল শচীনের উপর, কাজেই তাহার আদর-যত্ন অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। শচীনকে কিন্তু বড় মন-মরা বলিয়া বোধ হইল; তাহার সে' স্ফূর্তি আর নাই! সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। এ' বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর পাই নাই।

সে'দিন সকালে বিনোদের একখানি চিঠি পাইলাম; সেই সঙ্গে বৌদি'ও কয়েক লাইন লিখিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা না

করিয়া হঠাৎ চলিয়া আসায় তাঁহারা খুব দুঃখিত হইয়াছেন। বৌদি' লিখিয়াছেন—'কিরণের অনুরোধ, ভাইফোঁটার সময় উপস্থিত হইতে হইবে; কোন প্রকার ওজর চলিবে না।' এত বড় স্নেহের আহ্বানের কাছে কি আর কোন অভিমান থাকিতে পারে? হৃদয়ে সঞ্চিত সমস্ত বেদনা মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি উপস্থিত হইতে পারি। পত্রোত্তরে তাহাদিগকে তাহাই জানাইয়া দিলাম, পরিশেষে তাঁহাদের সহিত দেখা না করিয়া হঠাৎ চলিয়া আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

আনন্দ ও কলকোলাহলের মধ্য দিয়া পূজার দিন কয়টা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

মনে করিয়াছিলাম—মল্লিকারা পূজায় বাড়ী আসিবে; এবার কিন্তু তাহারা আর এখানে আসিল না। শুনিলাম—মধুপুরে না কোথায় গিয়াছে।

এ' কয়দিন পূজার গোলমালে এবং রাত্রি জাগরণে শরীরটা বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল; সে'দিন একটু সকাল সকালই শুইতে গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিলাম, চোখের পাতায় ঘুম ছিল না। কতক্ষণ আর ঐ ভাবে থাকা যায়? ভাল লাগিতেছিল না, উঠিয়া টেবিলের কাছে গিয়া বসিলাম। নীল আকাশের কোলে চন্দ্রমা হাসিয়া লুটো-পুটি খাইতেছিল, জানালা দিয়া তাহারই খানিকটা কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। সময়টা কবিতা লিখিবার উপযুক্তই বটে; সহসা আমার দ্বারে কে করাঘাত করিল; আমি কান পাতিয়া রহিলাম; আবার খট্‌খট্ শব্দ।

প্রশ্ন করিলাম 'কে ?'

বাহির হইতে উত্তর আসিল—'শচীন ! দরজা খোল।'

অসময়ে এখানে তাহার আবার কি প্রয়োজন হইল ? মনে মনে বেশ একটু বিরক্ত হইলাম।

কিন্তু উপায় কি ?

ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম।

শচীন আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া মুহূর্ত্তে আমার রাগ একেবারে জল হইয়া গেল।

টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলিল, 'ও, কবিতা লিখছিলি বুঝি ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'হ্যাঁ, তুই এসে' আমার সব ভাব একেবারে মাটি করে দিলি।'

শচীন বলিল—'চল না, নৌকো করে খানিকটা ঘুরে আসি !'

আমি বলিলাম—'সে কি রে, এই রাতে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে ?'

শচীন বলিল—'লাগ্‌বে না, জামাটা গায়ে দিয়ে নে'।'

কি জানি, কেন, আমারও খুব ইচ্ছা হইল, তাড়াতাড়ি শার্টটা গায়ে দিয়া তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ঘাটে একখানা ডিঙ্গী বাঁধা ছিল; দুইজনে গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। শচীন নৌকা ভাসাইয়া বৈঠা দিয়া উজান বাহিয়া চলিল।

ছল-ছল শব্দে নাচিতে নাচিতে নৌকা সম্মুখ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; চন্দ্র-কিরণ জলের উপর পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছিল। চারিদিক্ নিস্তব্ধ;—চন্দ্রালোকে অদূরের গাছগুলিকে একখানা ফ্রেমে বাঁধান

ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল। এই রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্তিতে আমার চিত্ত ভরিয়া গেল।

বাঁকটা ঘুরিয়া আসিয়া শচীন স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া হাল ধরিয়া বসিল; তরীখানি আপনা হইতেই স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে; বড় ভাল লাগিল জলতরঙ্গের ঐ মিষ্ট বাজ্না।

দুই জনেই চুপ-চাপ বসিয়া আছি।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ শচীন বলিয়া উঠিল—'মণি, তোকে আজ আমার জীবনের একটা অতি গোপন-কথা বল্‌ব; সে জন্যই তোকে এ' ভাবে নিয়ে এসেছি। বল্‌,—কারো কাছে এ' কথা প্রকাশ ক'র্‌বি না; আর পারিস্ যদি, আমাকে ক্ষমা করিস্! দারুণ অনুশোচনার গ্লানিতে আমার সমস্ত অন্তর ভরে' গেছে, বড়ই দুঃখে তোকে এ' কথা বল্‌ছি।'

আমি অবাক্-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিসের যে এ' ভূমিকা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একটু ভাবিয়া বলিলাম—'তুই যখন বারণ ক'র্‌ছিস্, তখন বল্‌ব না কাউকে।'

শচীন একটু ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—'মাঝে মাঝে যে আমি চরে যেতুম, তা' তো তুই জানিস্ মণি, সেখানে হারাণ মাঝির বিধবা মেয়ে রাইমণির সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'য়। বুড়ো মাঝি তো নৌকো নিয়ে গ্রামান্তরে চলে যেত', কখন' কখন' তিনচার দিন সে বাড়ী আস্‌ত না। আমি একটা মস্ত ভুল ক'রেছিলুম মণি! রাইমণি যে আমাকে পবিত্রভাবে ভালবেসেছিল, দাদারই মত ভক্তি করেছিল, তা' আমি অত সহজভাবে নিতে পারি নি।

তাকে চিন্‌তে ভুল ক'রেছিলুম; সে ছিল দেবী, আর আমি নরাধম। আমার অন্তরে জ্বলছিল লালসার তীব্র-বহ্নি।

সে বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝ্‌তে পেরেছিল, তাই একটু দূরে দূরে থাক্‌ত।

তার বাপ বাড়ী ছিল না; সেই সুযোগে একদিন আমি তাকে আমার পাপ বাসনা জানালুম। সে কেঁদে উঠ্‌ল, মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানা একেবারে সাদা হ'য়ে গেল।

আমি তার কাছে এগিয়ে যেতেই সে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বল্‌লে—'আজ আমায় ক্ষমা কর'! কাল এস' তুমি!

আমি চলে' এলুম। মনের কোণায় আনন্দের তুফান উঠ্‌ছিল।

পরদিন বুকভরা আশা আর আনন্দ নিয়েই রাইমণির ওখানে গিয়েছিলুম।

সেখানে গিয়ে যখন শুন্‌লুম রাইমণি জলে ডুবে মরেছে, তখন আমি একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম; বুঝ্‌লুম, দেবী নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত কলঙ্কের হাত থেকে আপনাকে মুক্তি দিয়েছে। আমার প্রাণের ভিতর হাহাকার করে' উঠ্‌ল'। কেউ না জানুক, আমি তো জানি, তার মৃত্যুর কারণ!'

শচীনের চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া জ্যোৎস্নাধারায় চক্ চক্ করিয়া উঠিল; আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ব্যথাতুর কণ্ঠে বলিলাম—'কি করবে ভাই, সামান্য মানুষ বই তো নও, ভুল তো পদে পদেই হ'বে! অনুশোচনাতেই

তো তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েছে; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তিনিই তোমাকে শান্তি দেবেন!'

অসহায়ভাবে, করুণ চ'খে সে আমার দিকে চাহিল।

তাহাকে বলিবার আর আমার কি আছে? হতভাগিনী রাইমণির জন্য অন্তর হইতে কান্না গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

হায় রে দুর্ব্বলা, অসহায়া নারী!

রাত্রি গভীর। চন্দ্র পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছিল।

আমি বলিলাম—'এবার বাড়ীর দিকে ফিরে চল' শচীন।'

সে ধীরে ধীরে নৌকার মুখ ফিরাইল।

তখন জোয়ার আসিয়াছে; সে একটু জোরে জোরেই বৈঠা টানিতে লাগিল। ছপ্ ছপ্ শব্দে ডিঙ্গীখানি সম্মুখ দিকে ছুটিয়া চলিল।......

যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন রাত্রি শেষ হইবার আর বেশী দেরী ছিল না। ধীরে ধীরে শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। ঘুম কিন্তু আসিতেছিল না; একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করিতেছিল।

—একুশ—

পরদিন উঠিতে খুবই বেলা হইয়াছিল; ঘুম ভাঙ্গিল সুখদার ডাকা-ডাকিতে। সে বলিল—'মা-ঠাকরুণ যে, খাবার নিয়ে তোমার জন্য বসে' আছেন, শীগগির যাও!'

এতখানি যে বেলা হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই তাড়া-তাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। গত রজনীর ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হইতেছিল।

আমাকে দেখিয়াই মামীমা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—'তোর কি কোন অসুখ ক'রেছে মণি? চোখ মুখ যে একেবারে বসে গেছে!'

কি যে, জবাব দিব তাহাই ভাবিতেছিলাম।

একটু হাসিয়া বলিলাম—'অসুখ করে নি; রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বলেই হয় তো অমন দেখাচ্ছে!'

কথাটা বোধ হয় মামীমার বিশ্বাস হইল না।

তিনি আমার কাছে আসিয়া গায়ে ও মাথায় হাত দিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তারপর স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, 'সকাল সকাল চান্ ক'রে, খেয়েদেয়ে একটু ঘুমো, শরীরটা ভাল হ'য়ে যাবে'খন।'

*   *   *   *

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করিয়া একটু ঘুমাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম; শয্যায় শুইলাম বটে, ঘুম কিন্তু আসিল না; দিবা-

নিদ্রার সঙ্গে বড় পরিচিত নই, কাজেই কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করিয়া উঠিয়া প'ড়লাম।

একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতেছিলাম; শচীন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল। তাহাকে আমার পাশে বসিতে বলিলাম।

সে ধীরে ধীরে আমার পাশের খালি চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল।

আমার মনে হইল—এ'ভাবে আর কিছু দিন চলিলে সে পাগল হইয়া যাইবে।

আমি তাহাকে বলিলাম—'দেখ শচীন, যা' হ'য়ে গেছে, তার জন্য তুমি অত দুঃখ কর কেন? এতে লাভই বা কি? কেন নিজের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করতে বসেছ? সংসারে এ'রকম ঘটনা তো নিত্যই ঘটছে, কে'কার খোঁজ রাখে বল? সে যে জলে ডুবে মরেছে, ওটাই ছিল তার নিয়তি, তুমি শুধু নিমিত্ত মাত্র। এতে কারো হাত নেই। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে তুমি সাবধান হয়ো! নিজে সৎপথে থেকে মানুষ হবার চেষ্টা করো!'

শচীনের চোখ দু'টী উজ্জলতর হইয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞ নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; মনে হইল—সে যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পাইয়াছে।

সে বলিল—'মুহূর্ত্তের ভুলে যে অন্যায় ক'রে ফেলেছি, তার জন্যে নিজেই জলেপুড়ে মরছি, সময় সময় আমার ইচ্ছা হ'ত, আমিও আত্ম-হত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারি নি, ভয়ে পিছিয়ে গেছি।'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—'দূর পাগল, ও চিন্তা মনে আনাও পাপ!' তারপর এই আলোচনা শেষ করিয়া ফেলিবার জন্য হঠাৎ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—'আচ্ছা শচীন, তুমি না একদিন বলেছিলে—মল্লিকা আমাকে খুব ভালবাসে?'

সে একটু জোর দিয়া বলিল—'হ্যাঁ, বলেছি, সত্যিই সে তোমাকে খুব ভালবাসে।'

আমি উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

বিস্ময়ভরে সে আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—'কি হাস্‌লে যে?'

হাসিতে হাসিতেই জবাব দিলাম—'তোমার ভুল শচীন, সে আমাকে মোটেই ভালবাসে না।'

'এ' কথা বল্‌ছ কেন, কিসে বুঝ্‌লে তুমি?' বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মল্লিকা সম্বন্ধে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। তারপর হাসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—'এখনও কি বল্‌তে চাও তুমি যে, মল্লিকা আমাকে ভালবাসে?'

সে কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে বলিল—'এমন কি হ'তে পারে না যে, সে তোমাকে ঠিকই ভালবাসে, শুধু মা-বাপের ইচ্ছায় পলাশের সঙ্গে মেশে?'

আমি হাসিলাম, কোন উত্তর দিলাম না। বলিবার কিই বা আছে? আমি জানি, আমার অন্তর জানে সে কাহাকে চায়! ইহার' আর কি যুক্তি দিব? অনেক জিনিস অন্তরে উপলব্ধি করা যায়, অথচ ভাষায় ঠিক্ ঠিক্ প্রকাশ করা যায় না।

*   *   *

বিকালে শচীনের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

আজ শচীনকে অনেকটা প্রফুল্ল দেখিলাম, বেশ সহজ-ভাবেই সে হাসিয়া কথা বলিতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা নদীর বাঁকের মুখ ছাড়াইয়া অনেকটা দূরে চলিয়া আসিয়াছিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই, অদূরে খালের মোহানার পাশ দিয়া একখানি ছোট নৌকা কয়েকজন আরোহী লইয়া ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। নৌকার ভিতর হইতে একটী বালিকা মধুর স্বরে গাহিতেছিল :—

'সম্মুখে রাঙ্গ-মেঘ করে খেলা,
ওগো, তরণী বেয়ে চল নাহি বেলা।'

গানটী ঠিক্ সময়োপযোগী, আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তন্ময় হইয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলাম।

সহসা শচীন আমার হাতে একটা চাপ দিল, আমি মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সে আস্তে আস্তে বলিল—'ঐ হারাণ মাঝি, রাইমণির পিতা।'

আমি আগ্রহ-ভরা দৃষ্টিতে মাঝির দিকে চাহিলাম। অনুমানে মনে হইল—তাহার বয়স পঞ্চাশেরও অধিক। মাথার চুলগুলি সব একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত, মুখে একটা বেদনার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে সে বৈঠা বাহিয়া চলিয়াছে, অবশ হস্ত যেন আর চলিতে চাহে না।

আপনা হইতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—'বেচারা।'

শোকাতুর মাঝির জন্য সত্যই বড় কষ্ট হইল। বুকভরা বেদনা লইয়া সেদিন ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

—বাইশ—

সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর মামীমার কাছে বসিয়া গল্প করিতে-ছিলাম ; হঠাৎ এক সময়ে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম—'কলেজ খুললেই একটা পরীক্ষা, এখানে আমার পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না, হোষ্টেলেই চলে যাই মামীমা ? সেখানে অন্য ছেলেরাও অনেকে রয়েছে।'

মামীমা বলিলেন—'ছুটির তো এখনও অনেক বাকী, এত আগেই যাবি ? কি অসুবিধে হচ্ছে তোর এখানে ? এখানে বুঝি আর পড়া হয় না ?'

আমি অভিমানের স্বরে বলিলাম—'এখানে পড়া হচ্ছে না বলেই তো সেখানে যেতে চাচ্ছি ; কলেজ খোলার আর কতই বা এমন দেরী আছে ? এক'টা দিন সেখানে গিয়ে পড়তে পারলেই ভাল হ'ত !

মামীমা বলিলেন—'তোর মামাবাবুকে জিজ্ঞেস কর, তিনি যদি বলেন তো যাস্ 'খন !'

আমি বলিলাম—'তুমি মামাবাবুকে বলো, আমার লজ্জা করে।'

মামীমা হাসিয়া বলিলেন—'বুড়ো-ছেলের লজ্জা দেখ, ওর কথা বল্‌তে হ'বে গিয়ে আমাকে !'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'তুমি বল্‌লেই হ'বে।'

রাত্রে খাইতে বসিয়া মামাবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হ্যাঁরে মণি, তোর এখানে পড়া হচ্ছে না ?'

আমি মাথা নীচু করিয়া বলিলাম—'এখানে ভাল লাগছে না !'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মামাবাবু বলিলেন—'বেশ, তবে একটা দিন দেখে, কল্‌কাতায়ই যা' ভাল করে' পড়, প্রথম বিভাগে পাশ করা চাই কিন্তু !'

আমি ধীর কণ্ঠে বলিলাম—'আচ্ছা !'

ইহার পর আর বিশেষ কোন কথা হইল না। মামাবাবু গ্রহাচার্য্যকে ডাকিয়া একদিন আমার যাত্রার শুভসময় পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন।

আমি চলিয়া যাইব বলিয়া আমার আদর-যত্ন আরও বাড়িয়া গেল। মামীমা পরিপাটি করিয়া আমার জন্য ভাল ভাল মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

খুসীতে আমার অন্তর ভরিয়া গেল। ভাইফোঁটায় কিরণের ওখানে যাইব বলিয়া আমাকে পরিশেষে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল। এমন-ভাবে এত সহজে যে, যাইবার অনুমতি পাইব, তাহা আশা করি নাই !

সেইদিনই বিনোদের কাছে একখানি চিঠি লিখিতে বসিলাম ; তাহাতে লিখিয়া দিলাম—সে যেন বৌদি' এবং কিরণকে জানায় যে, ভাইফোঁটায় আমি নিশ্চয় উপস্থিত হইব। শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি।

* * *

শচীনের মা সেদিন আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিল ; আমি জিজ্ঞাসু নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন--'তুই চলে যাচ্ছিস, একবার দেখা করতে এলুম মণি।'

মনে মনে বুঝিলাম—এখানে আসিবার ইহাই যথার্থ কারণ নহে, আর কোন উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই।

ঠিক হইলও তাহাই।

একটু পরেই তিনি কাজের কথা তুলিলেন; বলিলেন—'হ্যাঁ রে মণি, শচীনের কি হ'য়েছে? ভাল করে খায় না, আপন-মনে রাতদিন ছাইভস্ম কি ভাবে। মেজাজ হ'য়েছে খিটখিটে, আমি কিছু বললেই একেবারে চেঁচিয়ে ওঠে. এ'ক'দিন তুই ছিলি, একরকম কাট্‌ল মন্দ নয়, কি হ'য়েছে, কে জানে? আমার আর ভাল লাগে না, মলে বাঁচি। বলিয়া তিনি আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

আমি বলিলাম—'আমায় তো কিছু বলে নি শচীন, একটু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে বটে, এ থাকবে না, দু'দিনেই ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'তাই হোক্‌ বাবা, তাই হোক্‌' বলিয়া তিনি আমার দিকে চাহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন—'তুই যাবার সময় একবার তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে যাস্‌ বাবা!'

আমি বলিলাম—'ওকে বলেছি, আবার বলব'খন।'

তিনি বাহির হইয়া যাইবার একটু পরেই শচীন আসিয়া ঘরে ঢুকিল। খালি চেয়ারটার উপরে বসিয়া পড়িয়া সে আমাকে প্রশ্ন করিল—'মা এসেছিল কেন রে, কি বললে তোকে?'

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম--'তোরই কথা, তুই কেমন হ'য়ে গেছিস তাই বললেন, তোকে একটু বোঝাতে বলে গেলেন।'

'ওঃ' বলিয়া শচীন হাসিল।

আমি বলিলাম—'ঠাট্টা নয়, একটু ভাল হ'য়ে চল শচীন, মার প্রাণে কষ্ট দিস্ নি ভাই!'

'আচ্ছা, এবার থেকে তোর উপদেশ মতই চল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।' বলিয়া সে বলিতে লাগিল—'তুই যাচ্ছিস্ বটে, মুস্কিল হ'বে আমার, নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগ না, এ ক'দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'একা কেন রে? তোর মাকে বলি,—একটী টুকটুকে সুন্দরী বউ এনে দিন্।'

সে হাসিয়া বলিল—থাক্, আর বউয়ে কাজ নেই।'

* * * * * *

আজ আমার কলিকাতা যাইবার দিন।

যাইবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, আসন্ন-বিচ্ছেদ আশঙ্কায় আমার মনটা ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কিরণ এবং বৌদি'র কাছে যাইতে পারিব বলিয়া যেমন আনন্দ হইতেছিল, মামীমার স্নেহচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হইব বলিয়া দুঃখও হইতেছিল ততোধিক!

গুরুজনের পদধূলি এবং মামীমার অজস্র আশীর্ব্বাদ লইয়া শুভ মুহূর্ত্তে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

—তেইশ—

ভাইফোঁটার দিন সকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, বিনোদকে নিশ্চয় ষ্টেশনে দেখিতে পাইব, কিন্তু কোথায় বিনোদ!

হোষ্টেলে আসিয়া ওঠা গেল। সব খালি; কেহই এখানে নাই। দারোয়ান ঘর খুলিয়া দিল, জিনিস-পত্র সব ভিতরে রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া বিনোদের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বিনোদদের বাড়ী আসিয়া শুনিলাম—দিন দুই হইল তাহার জ্বর হইয়াছে; আজ এই আনন্দের দিনে, তাহার অসুখের কথা শুনিয়া মনটা একেবারে নিরানন্দে ভরিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি বিনোদের ঘরে গিয়া বসিলাম। সে একখানি চকোলেট্ রঙের আলোয়ান গায়ে মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে বসিয়া কিরণ; সে ধীরে ধীরে বিনোদের কপালে গোলাপ-জলের পটি দিতেছে।

আমি শয্যার একপাশে বসিয়া পড়িয়া বিনোদের গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম; জ্বর খুব বেশী বলিয়া মনে হইল না কিন্তু।

বিনোদ আমার কোলের উপর ধীরে ধীরে তাহার একখানি হাত রাখিল; আমি আঙ্গুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে হাসিয়া

বলিলাম—'অসুখের আর দিন পেলে না তুমি? আজকের দিনেই কি না?'

'কি করব?' বলিয়া সে ম্লান হাসি হাসিল।

আমি কিরণের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম—'বৌদি'কে দেখ্ছি না যে, তিনি কোথায় গেলেন?'

কিরণ বলিল—'সে বাপের বাড়ী গেছে, তার মার বড় অসুখ।'

আমি একেবারে দমিয়া গেলাম।

ঠিক্ এই সময় ঘরে প্রবেশ করিল, ভোলানাথবাবু। কিরণ খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম 'এই যে, আসুন!'

সেও প্রতি নমস্কার করিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল; সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া একজন মহিলা ঘরে প্রবেশ করিল। ভোলানাথবাবু সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—'আসুন হিরণদি'!'

আমি তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া একটু বিব্রত হইয়া ভোলানাথ-বাবুর দেখাদেখি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

কিরণ তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিল। পরিচয়ে জানিলাম, হিরণ তাহারই মামাতো বোন্, জয়পুরে থাকেন, সম্প্রতি পূজার ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহার স্বামী রসময়বাবু সেখানে কলেজের প্রফেসার। বৌদি'র কাছে যে পত্র দিয়াছি, তাহা তিনি দেখিয়াছেন এবং তাঁহারই কাছে আমার সমস্ত পরিচয় পাইয়াছেন।

হিরণের রং কিরণ অপেক্ষা ময়লা হইলেও মুখশ্রী তাঁহারই সুন্দর বেশী, তাঁহার চোখে এমন একটা দীপ্তি, মুখে এমন একটা সরল

লাবণ্য-শ্রী পরিস্ফুট, যাহা সহজেই সকলকে আকর্ষণ করে, একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়। একদণ্ডেই তিনি আমাকে একান্ত আপনার করিয়া লইলেন, চির-পরিচিতের মতই ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তাঁহার স্বামী রসময়বাবু বাড়ী ছিলেন না, কি একটা প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন; একটু পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের সঙ্গে আলাপ হইল, বেশ অমায়িক লোক, রসিকব্যক্তি, তাঁহার প্রতি কথাতেই হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছিল।

হিরণদি' তাঁহাকে একপাশে ডাকিয়া নিয়া গোপনে কি বলিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পর হিরণদি'ও বাহির হইয়া গেলেন।

ভোলানাথবাবুর কথায় বুঝিলাম, সেও বিনোদের অসুখ বলিয়া জানিত না। দিন সাতেক পূর্ব্বে কিরণের কাছ হইতে সে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল; তাহার পর আর এদিকে আসে নাই।

একটু পরেই হিরণদি' ফিরিয়া আসিয়া 'এস' ভাই, একবার পাশের ঘরে এস'।' বলিয়া তিনি আমাদের উঠিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভোলানাথবাবু ও আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

মুহূর্ত্তে কিরণ একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল।

পাশের ঘরে হিরণদি' আমাদের জন্য প্রচুর খাবারের আয়োজন করিয়াছিলেন। দুইখানি আসনে আমরা দুইজনে খাইতে বসিলাম; হিরণদি অন্নপূর্ণার মত যত্ন-সহকারে আমাদের পরিবেষণ করিতে লাগিলেন।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—'কি করব ভাই, তাড়াতাড়িতে বেশী কিছু করতে পারলুম না!'

আমরা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া উঠিলাম।

ইতিমধ্যে কিরণ আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের খাওয়া দেখিতেছিল। তাহার মুখখানি একেবারে কালিমাখা। কেন, কে জানে!

সে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আমার খাওয়া পাওনা রইল, দাদা ভাল হ'লে একদিন খাওয়াব।'

ভোলানাথবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'বেশ!'

সে আর কিছু বলিল না, ধীরে ধীরে বিনোদের ঘরে চলিয়া গেল।

পাণ চিবাইতে চিবাইতে আমরাও গিয়া বিনোদের পাশে বসিলাম; কিরণের রাগটা যেন মনে হইল, হিরণদি'র উপরেই গিয়া পড়িয়াছিল। কেন, কে জানে!

কিরণ হঠাৎ এক সময়ে হিরণকে বলিল—'বিকেলেও এঁদের খেতে বলে দাও, একটু ক্রটী রেখে আর লাভ কি?'

হিরণদি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া বলিলেন—'কি বল্‌লি, কিরণ?'

'ঠিক্‌ই বলেছি, নিজের ভায়ের অসুখ হ'লে আজ আর এ' উৎসব কর্‌তে পার্‌তে না তুমি!' বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হিরণদি'র মুখখানা একেবারে মড়ার মত সাদা হইয়া গেল; তিনি আর একটা কথাও বলিতে পারিলেন না; তাঁহার চোখ দুটী বেদনায় ছল ছল করিয়া উঠিল।

আমরা আর কি বলিতে পারি? কিছু বলা শোভাও পায় না।

বিনোদের দিকে চাহিয়া 'আজ উঠি ভাই!' বলিয়া ভোলানাথবাবু ও আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

—চব্বিশ—

বিনোদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পথে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। কিরণের এইরূপ নীচ ব্যবহারে সেও খুব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে দেখিলাম; হইবারই কথা। সত্যই কিরণের মন যে এত ছোট তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই; সমস্ত অন্তরটা তাহার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল।

ভোলানাথবাবু বলিলেন—'নিমন্ত্রণ করে এ'ভাবে আমাদের অপমান কর্‌বার কি প্রয়োজন ছিল? বিনোদের এমন কোন মারাত্মক অসুখ নয় যে, বাজার থেকে দু'টো মিষ্টি আর এনে দেওয়া যায় না! সে নিজে তো কোন ব্যবস্থাই আমাদের জন্য কর্‌লে না, হিরণ যদিও বা কিছু আয়োজন কর্‌লে, কোথায় তার কাছে সে কৃতজ্ঞ থাক্‌বে, না উল্টে তাকেই আবার অপমান!'

মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ বটে!

আমি ম্লান কণ্ঠে বলিলাম—'হঠাৎ আমাদের আস্‌তে বলে, কেন যে সে এ'রকম ব্যবহার কর্‌লে বুঝ্‌তে পারলুম না ভোলানাথবাবু। তার চিঠি পেয়ে বাড়ীতে মিথ্যা কথা বলে' আমাকে এখানে আস্‌তে হ'য়েছে; নইলে আরও দশ-বারদিন আমি সেখানে থেকে আস্‌তে পারতুম।'

ভোলানাথবাবু বলিলেন—'আমি তো ভাই, এদের কাছে জীবনে আর কিছু খাব না কোনদিন।' বলিয়া তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

মামীমার স্নেহ-শীতল-বক্ষ হইতে এ'ভাবে হঠাৎ চলিয়া আসায় আজ আমার সত্যই খুব অনুশোচনা হইতেছিল। সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল —কিরণের উপরে। ছিঃ ছিঃ এত নীচ সে। ভাবিয়া দেখিলাম—ওদের কাছে আর না যাওয়াই উচিত।

সংসারে মানুষ চেনা কঠিন।

দারুণ আঘাতে মনটা আমার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

কত কথাই আজ মনে পড়িতেছিল; মল্লিকা, যে আমার জীবনে প্রথম-সূর্য্যোদয়ের মত আসিয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্য আঁধার মনের কক্ষগুলি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া অস্তমিতা হইয়া গেল। কতই বা বয়স তাহার? ইহারই মধ্যে সে কি অভিনয়ই না করিল! নারী এমনই রহস্যময়ী বটে।

তারপর ধূমকেতুর মত আসিল কিরণ। দু'দিনের পরিচয় তাহার সহিত, ইহারই মধ্যে সে আমাকে মুগ্ধ করিয়া আপন করিয়া লইল। তারপর ভোলানাথবাবুর গল্প লেখার পর হইতে ধীরে ধীরে সে কেমন সরিয়া পড়িতে লাগিল। পর-পর সবগুলি ঘটনা বায়স্কোপের ছবির মত আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

পুরুষ এমনই মূর্খ। পতঙ্গের মত যে আগুনে পুড়িয়া মরে, তাহারই পিছনে ছুটিয়া যায়।

বার বার ঠকিয়াও কিন্তু আমার শিক্ষা হইতেছিল না। নহিলে

সামান্য একখানি চিঠিতেই নিজেকে এমন করিয়া হারাইয়া ফেলিব কেন? কি প্রয়োজন ছিল, তাড়াতাড়ি এখানে ছুটিয়া আসিবার? নিজেরও তো বোন ছিল, কই, সে তো আমাকে আহ্বান করে নাই। তবে কেন অমন করিয়া আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া মরি?

কিরণের কাছে তো আমি কোন অপরাধই করি নাই; তবে কেন সে আমাকে এমন করিয়া অপমান করিল?

আগের দিন ট্রেণে ঘুমাইতে পারি নাই, ভাবিয়াছিলাম —দিবানিদ্রা দিয়া শরীরটা একটু ভাল করিয়া লইব; বহু সাধ্য-সাধনা করিয়াও কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

কিরণের এই অপমানটা কিন্তু আমার কাছে 'শাপে বর' হইয়াছিল। এতদিন যেমন পড়িতে পারি নাই, এ' কয়দিন তেননই খুব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলাম; অবশ্য পরে ইহার ফলও বেশ ভালই হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে আমি আর বিনোদদের বাড়ী যাই নাই, আর যাইবার কোন মোহও ছিল না।

একদিন পথে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। এতদিন বিনোদের বাড়ী যাই নাই বলিয়া তিনি বহু অনুযোগ করিয়া বলিলেন— 'যাবেন না কেন মণিবাবু? আমিও তো যাচ্ছি, যা' নিয়ে অপমান, কিছু না খেলেই হলো!'

আমি কোনই উত্তর দিলাম না; মুখ টিপিয়া একটু হাসিলাম মাত্র। এত শীঘ্র এবং এত সহজে যে, ভোলানাথবাবু অতবড় অপমানটা ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তাহার কাছেই খবর পাইলাম—হিরণ্ময়া চলিয়া গিয়াছে। বিনোদ বেশ ভালই আছে, আমি না যওয়ায় সে খুব দুঃখিত। বৌদি' এখনো আসেন নাই, তাঁহার মায়ের অসুখ না কি খুব বাড়িয়াছে।

বৌদি'র জন্য সময় সময় মনটা কেমন করিয়া ওঠে। তিনি সত্যই আমাকে অন্তরের সহিস স্নেহ করেন। আমিও তাঁহাকে মনে প্রাণেই শ্রদ্ধা করি। আজ যদি বৌদি' এখানে থাকিতেন, তবে হয় তো আমার অন্তর-বেদনা একটু লাঘব হইত!

আমার অনাদৃত উপেক্ষিত জীবনে শুধু এই একজন নারীকেই পাইয়াছিলাম, যাঁহার স্নেহধারা হইতে আমি বঞ্চিত হই নাই।

সেদিন বিনোদ আসিয়া ধরিয়া বসিল—'যা হ'য়ে গেছে, ভুলে যাও ভাই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি! যেতেই হ'বে তোমায়—আমাদের ওখানে!'

বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

বিনোদকে আঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম—'এখন মানসিক অবস্থা বড় চঞ্চল, কিছুদিন যাক্ ভাই!'

সে আর অনুরোধ করিল না।

লক্ষ্য করিলাম—আমি আবার তাহাদের ওখানে যাইব শুনিয়া আনন্দে তাহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—পঁচিশ—

বছরখানেক পরের কথা।

ইহারই মধ্যে অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। আমি প্রথম বিভাগে আই-এ পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছিলাম।

মল্লিকাদের আর কোন খবরই আমি রাখি নাই; অর্থাৎ রাখা প্রয়োজন মনে করি নাই।

বিনোদ এবং বৌদি'র অনুরোধে বার কয়েক তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেকে কিছুতেই আর পূর্ব্বের মত মিশ খাওয়াইতে পারি নাই। ফলে, তাহাদের কাছে খালি অবহেলাই পাইয়াছি। তা' ছাড়া ভোলানাথবাবু এবং আমাকে তাহারা বিভিন্ন ভাবে দেখিত। কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ দুই জানে! তাহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে আমার হিংসা হইত। এ'ভাবে আর কতদিন চলে? কাজেই সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া একদিন আমি সরিয়া পড়িলাম। কোন আকর্ষণই আমাকে আর ফিরাইতে পারে নাই। তাহাদের অভিনয় শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি সেখানে যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছিলাম।...

সে'দিন ট্রামে হঠাৎ মল্লিকার বাবার সঙ্গে দেখা। আমি তাঁহাদের ওখানে আর যাই না বলিয়া তিনি খুব দুঃখ করিলেন। তারপর তিনি

ব্যথা-ভরা কণ্ঠে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পলাশ না কি আর কোথায় বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছে। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে মল্লিকার এখনও বিবাহ হয় নাই।

একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এত নীচ হইতে পারে! মাতাপিতার সামান্য একটু ভুলে, সংসারে এই রকম কতই না ক্ষোভের কারণ ঘটি-তেছে। মল্লিকার আর কি দোষ দিব? মা-বাপের উৎসাহ না পাইলে, সে অতটা সাহস পাইত না ইহা অতি সত্য কথা। স্ত্রী-পুরুষে এ'ভাবে মেলা-মেশা যে, কি ভীষণ তাহা অনেক পিতামাতাই বোঝেন না।

মল্লিকার জন্য মনটা বড়ই বেদনাতুর হইয়া উঠিল।

নামিবার সময় তিনি তাঁহাদের বাড়ী একদিন যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

মল্লিকার স্মৃতিটা নূতন করিয়া আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছিল। পলাশ যে এত হীন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া একটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়া গেল, ইহা ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মনে মনে স্থির করিলাম—একদিন মল্লিকার সহিত দেখা করিয়া তাহার মনের কথাটা জানিয়া লইলে হয় না? পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলাম, আমার কি মাথা ব্যথা, দরকার কি আমার আবার সেখানে যাইবার!

যে কারণেই হউক, মল্লিকা পলাশকে অন্তরের সহিতই গ্রহণ করিয়া-ছিল, মন-প্রাণ দিয়াই ভালবাসিয়াছিল কিন্তু প্রতিদানে সে তাহার কাছে খুব শিক্ষাই পাইল!

"ইদানীং আমি আর কোথাও বড় একটা বাহির হইতাম না; আমার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া হোষ্টেলের বন্ধুর দল মধ্যেমধ্যে ব্যঙ্গ

করিত। কি করিব? হাসি মুখেই আমাকে তাহাদেরসমস্ত বিদ্রূপ-বাণ সহ্য করিতে হইত!

মল্লিকা এবং কিরণদের সঙ্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আমার দিন একরকম বড় মন্দ কাটিতেছিল না। প্রথম দিনকতক খুবই কষ্ট হইয়াছিল, একা-একা মোটেই ভাল লাগিত না। সর্ব্বদা ব্যাজার হইয়া থাকিতাম।

দুই-একদিনের মধ্যেই কিন্তু আমি পথের সন্ধান পাইলাম। আঘাত পাইয়া আমার লেখনীর উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, কাজেই মনের গতি ফিরাইয়াছিলাম, ঐদিকে। গল্পে এবং কবিতায় খাতার পাতাগুলি ভরিয়া ফেলিয়াছিলাম। লেখা প্রকাশের জন্য এখন আর ব্যস্ত ছিলাম না; নীরবে শুধু লিখিয়াই যাইতেছিলাম।

কিরণ এবং বৌদি'কে লইয়া ভোলানাথবাবুও 'কল্লোলিনী'র প্রায় প্রতি সংখ্যা ভরিয়া তুলিতেছিলেন। কিরণকে দিয়া জোর করিয়া গল্প লেখাইয়া, নিজে সংশোধন করিয়া 'কল্লোলিনী'তে প্রকাশ করিতে-ছিলেন। নানা কৌশলে মায়াজাল বিস্তার করিয়া ধীরে ধীতে তিনি সকলের চিত্তই জয় করিয়া লইতেছিলেন।

ভোলানাথবাবু ছলনার দ্বারা আমার যতই অপকার করিয়া থাকুন না কেন, এক বিষয়ে তিনি আমার উপকার করিয়াছিলেন যথেষ্ট। আমি খুব সরল এবং সহজভাবেই সকলের সঙ্গে মিশিতেছিলাম; তিনিই আমাকে মানুষ চিনিবার কৌশলটুকু শিখাইয়া দিয়াছিলেন। এখানেই তিনি মস্ত ভুল করিয়াছিলেন। নিজেকে আমার কাছে ধরা দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

দু'দিনেই কিন্তু আমার চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল, ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম —তাহার গলদ কোথায় ?

কিরণের 'মনের কথা' সুরুচি মধ্যে মধ্যে বিনোদদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। ভোলানাথবাবুর শ্যেন-দৃষ্টি পড়িয়াছিল তাহারই উপরে। কিরণকে দূতি করিয়া, তাহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে গোপন ছিলনা; সে জন্য তিনি এই সময়ে আমার সঙ্গে মিশিবার খুবই চেষ্টা করিতেন।

এক সময়ে তিনি গল্পে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমাকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে হেয় করিবার যে জঘন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ভয়, পাছে এই সুযোগে আমিও তাহার প্রতিশোধ লই। আমি কিন্তু সে'দিক দিয়া মোটেই গেলাম না। যখন ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হইয়া আসিতেছিল, তখন একদিন আমিই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়া তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিলাম।

তাঁহার একটা মহা ভাবনা কাটিয়া গেল, তিনি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

যবনিকার অন্তরালে তাহাদের যে লীলাখেলার সুরু হইল তাহার শেষ কোথায় কবে কি ভাবে হইবে কেজানে !

—ছাব্বিশ—

গ্রীষ্মের ছুটীতে সুষমা-মণ্ডিত ছায়া-শীতল গ্রামখানিতে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

মনে মনে আশা করিয়াছিলাম—মামীমার স্নেহ-শীতল মঙ্গল-স্পর্শে আমার বঞ্চিত-তৃষিত-হৃদয়ে হয় তো একটু শান্তি পাইব! কিন্তু এ'কি হইল? মামীমা যেন আমার কাছে আর সহজে আসিতে চান্ না, নিজেকে সর্ব্বদা দূরে দূরে রাখিয়া চলেন। আমি কিন্তু কারণটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কেন এমন হইল, কে জানে? মনে হইল—

'অভাগা যেদিকে চায়,
সাগর শুকায়ে যায়।'

সুখদা সকল বিষয়ে আমার তদারক করিত। সে একদিন ফিস্ ফিস্ করিয়া আমাকে বলিল—'তোমার যে ভাই হ'বে, মাঠাক্রুণ তোমার কাছে তাই বেরোয় না; তার বড় লজ্জা করে কি না!'

মামীমার এই পরিবর্ত্তনের কারণটা জানিতে পারিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। মনে মনে খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। মামাবাবুকে এই জন্যেই আজকাল এত প্রফুল্ল দেখি! আনন্দেরই কথা বটে!

একটী পুত্র লাভের জন্য মামা-মামী কত কাণ্ডই না করিয়াছিলেন; কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখনই তাঁহারা আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে

বরণ করিয়া লইয়াছিলেন দারুণ হতাশায় তাঁহারা তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। এতদিন পরে অধিক বয়সে মামীমা যখন সন্তান-সম্ভাবিতা হইলেন, তখন তাঁহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ঈশ্বরের কি অদ্ভুত লীলা! যখন দেন এমনই করিয়াই দেন, কাহারও যাচিঞার অপেক্ষাই আর রাখেন না।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমার ঘরে শুইয়া কি একখানি বই পড়িতে-ছিলাম ; ধীরে ধীরে শচীনের মা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে আমার পাশটীতে বসিয়া পড়িয়া কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতে লাগিল—'এবার তোমার আদর ঘুচ্‌ল মণি! আমাদের আর কি? আজ আছি, কাল নেই। তোমার মামীমা তো পোয়াতি। মাস ছয়েক ধরে কি কাণ্ডই না হচ্ছে! একজন সন্ন্যাসী এসে,' কত পূজো-অর্চ্চা, জপ-তপ করে বলে গেছে—ছেলে না কি হ'তেই হ'বে তোমার মামীমার। একেই বলে, সাক্ষাৎ দেবতা! হলোও তো তাই। দু'টো মাস যেতে না যেতেই সন্ন্যাসীর কথা সত্য হলো।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'বেশ তো ভালই হ'য়েছে, মামীর মনে কি কম কষ্ট ছিল!'

শচীনের মায়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

সে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—'সে কি রে মণি, আমাকে যে তুই অবাক্ করলি? তোর কি অবস্থা হ'বে—কিছু বুঝ্‌তে পারিস্?' আমি মনে মনে একটু বিরক্তই হইয়াছিলাম ; এই অপ্রিয় আলোচনাটা

আমার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম—'বোঝ্‌বার আর কি আছে? মামীমার যদি দু'টী ছেলে থাকৃত, একটীকে কি আর তিনি ফেলে দিতে পারুতেন?

শচীনের মা হাসিল। তারপর গম্ভীর ভাবেই বলিল—'নিজের ছেলে আর পরের ছেলে, অনেক তফাৎ রে মণি! একদিন আমার কথা তুই বুঝ্‌তে পারবি, দেখিস্।' বলিয়া গম্ভীর ভাবে সে চলিয়া গেল।

আমি স্তব্ধ হইয়া বিষয়টা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মামীমা কি সত্যই আমাকে একেবারে পর করিয়া দিতে পারিবেন? এতদিনকার স্নেহ-যত্ন ভালবাসা সব কি তিনি ভুলিয়া যা-তে পারিবেন? অসম্ভব! আর যদি সত্যই তিনি সব ভুলিয়া যান, তাহাতে আমার দুঃখ করিবার কি আছে? তিনি আমাকে যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। এতটাই বা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? এমনই কত কি ভাবিতেছিলাম।

হঠাৎ একদিন আমার মা-বাবা আসিয়া উপস্থিত। মামীমা যে সন্তান-সম্ভাবিতা এই শুভ-সংবাদটা গোপন ছিল না; অতদূরে তাঁহাদের কানে গিয়াও পৌঁছিয়াছিল; তাই তাঁহারা আনন্দের আতিশয্যে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

এতদিন পরে তাঁহাদের দেখিয়া মামা-মামী খুব খুসী হইলেন, আমি মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। মা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন,-'কিরে মণি', কেমন আছিস্ অনেকখানি বড় হ'য়েছিস যে? ভুলেও কি একবার মা-বাপের কাছে যেতে নেই রে?'

কথাটা আমাকে আঘাত করিল।

ভুল কাহার? তাঁহারা তো সন্তানের সমস্ত দাবী-দাওয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে কোন খবরই লন নাই আমার! আজ এ'কথা বলিলে চলিবে কেন?

তাঁহাকে বলিবার আর কি আছে? চুপ করিয়া রহিলাম। অভিমানে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া গেল।......

মামীমার সন্তান হইবে জানিয়া মা মুখে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেও মনে মনে কিন্তু একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলেন। তাঁহার এতদিনের সঞ্চিত আশা-মুকুল এমনই করিয়া ঝরিয়া পড়িবে তাহা কে জানিত!

মা বাবায় গোপনে অনেক কথাই হইত। সে দিন স্পষ্ট শুনিলাম—মার কি একটা কথার উত্তরে বাবা বলিতেছেন—'নিরাশ হ'বার, এখনো কোন কারণ নেই! ছেলে হয় কি মেয়ে হয় তারো কিছু এখনও ঠিক্ নেই, তারপর বেঁচে বর্ত্তে থাকে তবে তো?'

মা বলিলেন—'আমি সেই জল-পড়ার ব্যবস্থাটাও করেছি, দেখা যা'ক্ কি হয়।'

আমি একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম। স্বার্থের জন্য মানুষ এমন হইতে পারে? দারুণ বিতৃষ্ণায় অন্তরটা আমার ভরিয়া গেল। এ ভাবে বড় হওয়ার অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও শ্রেয়। মা-বাবার এ ব্যবহারে আমার মন একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মনে মনে স্থির করিলাম—কিছুতেই এতবড় অঘটন ঘটিতে দিব না। যেমন করিয়াই পারি, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে।......

মার সঙ্গে শচীনের মায়ের খুব ভাব হইয়া গেল; গঙ্গা-যমুনার

মতই দুইজনে মিশিয়া গিয়াছিলেন। রাত-দিন দুইজনে গোপনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব কথা হইত !

তাঁহাদের এই গোপন পরামর্শের ইতিহাস আর কেহ না জানিলেও আমি জানিতাম ; এবং জানিতাম বলিয়াই মনে মনে শিহরিয়া উঠিতাম। সুদক্ষ-ডিটেকটিভের মতই আমি তাঁহাদের গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম।

স্থির করিলাম এই অপ্রিয় আলোচনার এখানেই শেষ করিয়া দিব। শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি—'আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। মামীমার অনাগত শিশুটীকে নষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা একজন মুসলমান ফকিরের শরণাপন্ন হইয়া তাহার কাছ হইতে জল পড়া আনিয়া মামীমার শয্যার কাছে রাখিয়া আসেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, মামীমা রাত্রিতে জল খান। আমি গোপনে সেই জল ফেলিয়া দিয়া কলসীর জলে গ্লাসটী পূর্ণ করিয়া রাখি। তাঁহারা কিন্তু ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই ; কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের সাফল্যের গৌরবে মনে মনে খুবই খুসী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরেই মা-বাবা চলিয়া গেলেন ; যাইবার পূর্ব্বে আমাকে অনেক হিতোপদেশ দিয়া গেলেন। যাক্ সে সব কথা এখানে উল্লেখ না করাই সমীচীন।

—সাতাশ—

সকাল বেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম, নিতাই আসিয়া জানাইয়া গেল,—মামীমা ডাকিতেছেন।

হঠাৎ মামীমার ডাকের কারণটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; কাগজটা রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম।

মামীমা আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহার হাতে একখানি খাম। আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন—'ওরে মণি', মল্লিকার মা চিঠি লিখেছে, তোর সঙ্গে ওর মেয়ের বিয়ে দিতে চায়; এই নে পড়ে দেখ্।' তারপর তিনি আপন মনে গজ্ গজ্ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'লজ্জা করে না লিখ্‌তে? ছেলে কি আমার জলে পড়েছে যে, ওর ওই পটের বিবির সঙ্গে বিয়ে না দিলেই নয়! ভাল ছেলে পেয়েছিল, যাক্ না তার কাছে এখন, আবার এখানে আসে কোন্ সাহসে?' মামীমা আপন মনে এমনই কত ক বকিয়া যাইতেছিলেন।

চিঠিখানা পড়িলাম। মল্লিকার মা সকাতরে বহু অনুনয় করিয়া মল্লিকাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পলাশের সঙ্গে মল্লিকার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছিল, আদ্যন্ত সমস্ত ইতিহাসটা জানিয়া

কোন ক্রমেই তাহাকে আর গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার জন্য বড় দুঃখ হইল। উপায় কি? আমি মনে মনে যে মায়াপুরী রচনা করিয়াছিলাম, তাহা সে নিজেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

মামীমা বলিলেন—'পড়্লি তো, দেখ্ কি সাহস মল্লিকার মার। ঐ ভ্রষ্টা মেয়েকে নিয়ে এখন আমার বউ করতে হ'বে? দেখ্না কেমন শুনিয়ে এর জবাব লিখে দি। আস্পর্দ্ধা তো কম নয় তার।'

আমি চিঠিখানি তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিলাম। অতীতের অনেক কথাই মানস পটে ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল।

মল্লিকার বিবাহের বয়স হইয়াছিল অনেকদিন; শুধু পলাশের আশায় থাকিয়াই এতদিন তাহার বিবাহ হয় নাই। নহিলে পূর্ব্বে অনেক ভাল ভাল স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তাহার পিতা ইচ্ছা করিয়াই তখন তাহার বিবাহ দেন নাই। তারপর পলাশের সঙ্গে যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, ইহার জন্য দায়ী তো তাহার মাতা-পিতাই। অতটা বাড়াবাড়ি কোন ক্রমেই উচি[illegible] হয় নাই তখন, এখন তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে।

এমনই কত কথা আপন মনে ভাবিয়া যাইতেছিলাম। মল্লিকা[illegible] সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেও তাহার মধুর স্মৃতি কিছু[illegible] মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিলাম না। একদিন অযাচিত ভাবে [illegible] যে অসীম ভালবাসা দিয়াছিল, তাহা একেবারে ভুলিয়া যা[illegible] সুকঠিন, একটা দুঃস্বপ্নের মতই মনটা সময় সময় ভারাক্রান্ত [illegible] উঠিত।

শচীনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! রাইমণির মৃত্যুর পর তাহার অনুশোচনা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম—এইবার বোধ হয় সে ভালর দিকে যাইবে, স্বভাবের পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হইবে।

কিন্তু আমার ভুল ধারনা। দুইদিন যাইতে না যাইতেই তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল, সে দ্রুত পাপের পথে ছুটিয়া চলিল। ইদানীং সে আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা-শোনা করিত না সর্ব্বদা নিজেকে আড়ালে রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিত।

তাহার সহিত মিশিতে আমারও আর আগ্রহ ছিল না। মনে মনে তাহাকে ঘৃণাই করিতাম। বিতৃষ্ণায় সারা অন্তর আমার ভরিয়া গিয়াছিল।

আমার সমস্ত অনুরোধ, উপদেশ উপেক্ষা করিয়া সে অসুন্দরকেই বরণ করিয়া লইয়াছে, যত সব ছোট লোকেরাই হইয়াছে—তাহার সঙ্গী-সাথী। তাহার উপর কোন ক্রমেই সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

তাহার ব্যবহারে মামাবাবুর মাথা কাটা যাইত। প্রজারা যখন মধ্যে মধ্যে শচীনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া যাইত, মামাবাবু লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতেন। প্রথম প্রথম তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন বটে; কিন্তু এখন কিছু বলিতে মামাবাবুরই কেমন লজ্জা বোধ হইত, বাধ-বাধ লাগিত।

সে'দিন মামাবাবু খুব দুঃখের সহিতই শচীনের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। নায়েব-গোমস্তারা খাজনা আদায় করিতে গিয়া শচীনকে সেখানে যে অবস্থায় দেখিয়া আসে, তাহাতে তাহাদেরই লজ্জা করে। এমনই কত কি।

সে এখন শাসনের বাহিরে। কোন প্রকার শাসনকেই সে আর গ্রাহ্য করে না। তাহার মাকে সে কোন দিনই ভয় করে নাই, এখনো করে না।

মামাবাবু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন—এ'ক'টা দিন গেলে, উহাদের এখান হইতে একেবারে সরাইয়া দিবেন। প্রয়োজন হয় মাসিক কিছু সাহায্য করিলেই চলিবে। ঐ কুলাঙ্গারকে রাখিয়া কোন ক্রমেই নিজের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা চলে না।

শচীনের মা মধ্যে মধ্যে আমার কাছে পুত্রের জন্য দুঃখ করিতে আসিয়া মায়া-কান্না জুড়িয়া দিত; তাহায় কান্না আর শেষ হইতে চাহে না। আমি বিব্রত হইয়া পড়িতাম। বুঝাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতাম।

একটু শান্ত হইয়াই সে মামীমার কথা তুলিত। তাহার ধারণা ছিল—মামীমার অনাগত শিশুটীই আমার কণ্টক। তাহাকে বিনষ্ট করিলেই আমি সুখী হইব; তাই সে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি-চুপি বলিত—'তুই নিশ্চিন্ত থাকিস মণি, তোর কোন ভয় নেই। ঐ পাপ দূর হ'বেই; তুই দেখে নিস্! আমায় কিন্তু ভুলিস্ নি শেষে ?'

প্রথম প্রথম চুপ করিয়া থাকিতাম; কিন্তু ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। একদিন আর পারিলাম না, তীব্রস্বরেই প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে বেশ দুটো কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর হইতেই সে আমার কাছে আর বড় আসিত না।......

মামীমা এখন হইতেই অনাগত শিশুটীর জন্য একটী নূতন সংসার

পাতিতেছিলেন। ছোট ছোট পোষাক, কাঁথা ও খেলনায় দুই তিনটী আলমারী একেবারে বোঝাই করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ছেলে কিংবা মেয়ে হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই, কাজেই সমস্ত জিনিস দুই সেট্ করিয়া হইয়াছিল। মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে মামীমার অন্তর ভরিয়া গিয়াছিল।

আনন্দ হইবারই কথা। কত আরাধনার পর আজ তাঁহার সকল আশা সফল হইতে চলিয়াছে। খোকা কিংবা খুকী হইলে কি বলিয়া ডাকিবে, এখন হইতে তাহার জন্য সুন্দর সুন্দর নাম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য এখন হইতে গুণ গুণ করিয়া ছড়া বলিতে থাকিতেন।

শচীনের মা হাসিত। আড়ালে বলিত—'কি ঘেন্নার কথা গো! বুড়ো মাগীর রকম দেখে হাসি পায়, আমরা যে লজ্জায় মরে যাই একেবারে।'

এমনই কত কি!.........

—আটাশ—

কলেজ খুলিবার আর দেরী ছিল না।

একদিন নিভৃতে সুখদাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম—সে যেন শচীনের মায়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

সুখদা তাঁহাকে একটু সন্দেহের চ'খেই দেখিত, কাজেই হাসিয়া বলিল—'আমাকে কিছু বল্‌তে হ'বে না!'

তারপরই আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি।

* *

বিনোদ মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। এখন সে আর আমাকে তাহাদের বাড়ী যাইবার জন্য কোন অনুরোধই করিত না।

আমি বাঁচিয়া গিয়াছিলাম।

তাহাদের বাড়ীর খবরটা কিন্তু সবই আমার কানে আসিত। তাহারই মুখে শুনিলাম—বৌদি' এখন পিত্রালয়েই আছেন; তাঁহার মায়ের অসুখ আবার বাড়িয়াছে। ভোলানাথবাবু আজকাল বড় একটা তাহাদের বাড়ী যান না।

আমি খালি শুনিয়াই যইতাম, তাহাকে কোন প্রশ্নই করিতাম না।

বিনোদেরও এই সময় লেখার ঝোঁক পড়িয়াছিল একটু বেশী। নূতন কিছু লিখিলেই সে আমার কাছে লইয়া আসিত।......

নারীর রূপ

সে'দিন কলেজ হইতে ফিরিয়াই মামাবাবুর একখানি চিঠি পাইলাম।

চিঠিখানি পড়িয়াই মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। মামাবাবু লিখিয়াছেন—শচীন সিন্ধুক হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার মা কান্নাকাটী করিতেছে, এবং কেলেঙ্কারীটা আরও প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া পুলিশে খবর দেওয়া হয় নাই। শচীন একাই যায় নাই, সে যাইবার পর হইতে তারকদাসের বিধবা পুত্রবধূ মালতীরও কোন সন্ধান নাই। কয়েকদিন ধরিয়া শচীনকে তাহাদের বাড়ীর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে অনেকে দেখিয়াছিল।

ব্যাপারটা জলের মতই পরিষ্কার। মালতী যে শচীনের সঙ্গেই গিয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রহিল না।

লজ্জায়, ঘৃণায় মামাবাবু কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিতেছিলেন না। শচীন যে এমন করিয়া কলঙ্ককালিমা লেপিয়া যাইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। টাকার জন্য তাঁহার তত দুঃখ হইতেছিল না, যত দুঃখ হইতেছিল—এই অপমানজনক ঘৃণিত নারীহরণের জন্য।

গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল—জমীদারের আত্মীয় শচীন মালতীকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।......

পত্রখানি পড়িয়া আমার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু আপনা হইতেই গড়াইয়া পড়িল! মামাবাবুর অবস্থাটা আমার চোখের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

শচীনকে আমি অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলাম, সে কোন উপদেশই শুনিল না। পাপের চরমে গিয়া পৌছিল। রাইমণির মৃত্যুর পর তাহার আত্মগ্লানি দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম, বুঝি সে এইবার মানুষ হইবে !

মনুষ্যত্বের খুবই পরিচয় দিল সে।

মালতীকে লইয়া যদি সে কলিকাতাতেই আসিয়া থাকে, ঠিকানা জানা না থাকিলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। এত বড় শহরে কোথায় তাহার খোঁজ করিব ?

পথ চলিবার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া চলিতাম—যদি শচীনেব দেখা পাওয়া যায় !

শচীনের কোনই সংবাদ পাওয়া যায় নাই ; মামাবাবুর অতগুলি টাকা তো গিয়াছেই, তাহার উপরে অমন একটা বিশ্রী কাণ্ড, তবুও তাঁহার শান্তি নাই ; শচীনের মায়ের জ্বালায় অস্থির। রাত দিন তাহার বিলাপ করিয়া কান্না লাগিয়াই আছে। মামাবাবু একেবারে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সেদিন মামীমার একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহাতে জানিলাম—শচীনের মা নাকি তাহার গুণধর পুত্রের এই কাণ্ডের জন্য মামীমাকে দায়ী করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বিবাদ করে। বলে—তাঁরই আদরে পুত্রটী বিগড়াইয়া গিয়া এমন অঘটন ঘটাইল। কি কুক্ষণে সে এখানে আসিয়াছিল ইত্যাদি—

আমার হাসি পাইল। বাংলায় একটা কথা আছে—'চোরের মায়ের বড় গলা।' কথাটা বাস্তবিকই ঠিক্।

পরিশেষে মামীমা লিখিয়াছেন—'শচীনের মাকে এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইবে।'

কি জানি কেন, সে মামীমার কাছ হইতে চলিয়া যাইবে শুনিয়া আমার খুব আনন্দ হইল।

সে চলিয়া গেলে আর যাহাই হউক, অন্ততঃ মামীমার অনাগত শিশুটীর যে কোন অমঙ্গল হইবে না, এ অতি সত্য কথা।

* * *

সে'দিন পথে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। তিনি আর আমাকে ছাড়িতে চাহেন না। অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। তাঁহারই কাছে শুনিলাম—হিরণদি'রা এখানে আসিয়াছেন; রসময়-বাবুর কলিকাতায় কোন্ একটা কলেজে কাজ হইয়াছে, তাহারা মির্জ্জা-পুর ষ্ট্রীটে থাকে। ভাই-ফোঁটার ঐ কাণ্ডের পর তাঁহার সহিত আমার আর দেখা হয় নাই; হিরণদি' ভোলানাথবাবুকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—আমি যেন তাহাদের সহিত দেখা করি।

একদিনের পরিচয় হিরণদি'র সঙ্গে; তাহাতেই তিনি কি অযাচিত স্নেহই না দিয়াছিলেন! অত আদর আপ্যায়ন ভুলিবার নহে। মনে মনে স্থির করিলাম—একদিন গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আসিতে হইবে। নহিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়।

বিনোদদের কথা উঠিতেই ভোলানাথবাবু ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—'ওদের ব্যবহারে সত্যি ঘৃণা ধরে গেছে, ওরা এত দাম্ভিক আর ওদের মন এত ছোট যে, য'ার একটুও মনুষ্যত্ব আছে,

সে সেখানে কিছুতেই যেতে পারে না! ওরা লোককে খাইয়ে-দাইয়ে মনে করে করুণা করছে। তাছাড়া বিনোদ একটা 'ইডিয়ট্' ওর নিজের কোন সত্তাই নাই। হেসে হেসে সেদিন আমায় বল্লে আমি নাকি ওদের বাড়ী 'ভগিনী-প্রেম' করতে যাই। কথাটা শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলুম, এত নীচ ও!'

আমিও কম বিস্মিত হইলাম না।

হঠাৎ ভোলানাথবাবু এত বীতরাগ হইয়া উঠিলেন কেন বুঝিলাম না।

কোন জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ভোলানাথবাবুই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সেদিনই বুঝিয়াছিলাম ইহার বিষময় ফল একদিন তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

হইলও তাহাই।

অত প্রেম কোথায় গেল এখন?

মানুষ চেনা কঠিন।

ভোলানাথবাবু কিরণকে অত স্নেহ করিয়া কেমন করিয়া যে অত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন, বুঝিতে পারিলাম না। এখন আবার নূতন করিয়া আসন পাতিয়া লইয়াছেন হিরণ'দির ওখানে।

—ঊনত্রিশ—

সে'দিন আমার নামে লাল খামে শুভ-বিবাহ লেখা একখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত; বুঝিতে পারিলাম না, কোথা হইতে আসিল এখানি। তাড়াতাড়ি খামের মুখটা ছিঁড়িয়া ফেলিতেই দুই খানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। একখানি ছাপান নিমন্ত্রণ পত্র, আর একখানি লিখিয়াছে মল্লিকার বাবা, মল্লিকার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, আমাকে যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে। সময় অভাবে তিনি নিজে আসিতে পারিলেন না।

মহাভাবনায় পড়িয়া গেলাম।

কি করিব? আমার সেখানে যাওয়া উচিত কি না কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

মনে মনে যাইবার ইচ্ছা ছিল খুবই, কিন্তু লজ্জাও হইতেছিল বড় কম নয়!

যাহা হউক, ভাবিয়া স্থির করিলাম—বিবাহের সময় একবার আমাকে যাইতেই হইবে। মল্লিকাকে কিছু উপহার দিয়া আসিতে হইবে।

অনেক কিছুই ভাবিতেছিলাম।

কি রকম বর হইবে কে জানে! মল্লিকা যে ভাবে মানুষ হইয়াছে, পাত্রের সহিত তাহার মিল হইলে হয়!

পলাশের ব্যাপারটা গোপন থাকিবে না, একদিন প্রকাশ হইয়া

পড়িবেই। তখন তাহার সহিত কি রকম ব্যবহার করিবে সে, তাহাও কিছু বলা যায় না।

ভাবনার অন্ত ছিল না।

তাহাকে একদিন মনে-প্রাণেই ভালবাসিয়াছিলাম, শুধু তাহাদের ছলনায়, কতগুলি অপ্রিয় ঘটনায় সব ওলটপালট হইয়া যায়। উল্কার মত পলাশ আসিয়া আমাদের মিলন-ডোর ছিন্ন করিয়া দিয়া বুদ্‌বুদের মত কোথায় বিলীন হইয়া গেল। নহিলে·········

স্মৃতির দাহনে একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিলাম।

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর মল্লিকাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। আলোক-মালায় বাড়ীখানি বেশ সুসজ্জিত হইয়াছে দেখিলাম, কিন্তু মল্লিকার মনের আঁধার দূর হইয়াছে কি না কে জানে?

বর তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

মল্লিকার বাবা আমাকে সাদরে ডাকিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। আরো আগে না আসার জন্য আমাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া অনুযোগ করিলেন।

একটা বাজে কারণ দেখাইয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

মল্লিকার মা আজ খুবই আদর করিলেন; বুঝি তাহার নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পলাশের মোহে আকৃষ্ট না হইলে, আমাকেই জামাতা করিয়া লইতে পারিতেন, সামান্য একটু ভুলের জন্য জীবন-নাট্যের দৃশ্যের কত ওলট-পালটই না হইয়া গেল।

সংসারে এ'রকম ঘটনা কতই না ঘটিতেছে, সামান্য একটুখানি ভুলের জন্য কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে।

মল্লিকা ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার মুখখানি বড়ই মলিন, বেদনা-কাতর বলিয়া মনে হইল। সে নিজেকে চিন্তা-সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিল। আমি যে কখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই, চমক ভাঙ্গিল তাহার মায়ের ডাকে।

তিনি বলিলেন—'মল্লিকা, তোর মণিদা' এসেছে দেখ্। আমি বলেছি না, সে আসবেই।'

মল্লিকা তাহার ডাগর চোখ দু'টী তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, কালো কালো তারা দু'টী উজ্জ্বল হইয়া মুহূর্তে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। ক্ষীণ হাসির রেখাটী অধরে বিলীন হইয়া গিয়া কান্নায় মুখখানি কালীমাখা হইয়া চোখ দু'টী জল ভরে ছল ছল করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে মুখনামাইয়া লইল।

তাহার অন্তর-বেদনা বুঝিতে পারিলাম, এবং সেই জন্যই বুঝি আঘাতটা খুব জোরের সহিতই আমার হৃদয়ে গিয়া প্রতিহত হইল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই সচকিত হইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়া-ছিলাম, কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিয়া লইলাম; ভুলিয়া গেলাম সমস্ত অতীত।

মীনা করা একটা, সোনার ব্রচ্, সেণ্ট্, সোপ, স্নো ইত্যাদি যে সকল উপহার লইয়া গিয়াছিলাম তাহা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম—'অতীতকে একেবারে ভুলে গিয়ে, ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলো মল্লিকা। নারীর গৌরবটুকু অক্ষুন্ন রেখ' এই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ! সুখী হয়ো তুমি।'

আমার বুকের ভিতর তুফান উঠিয়া একটা মহা-আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। নিজেকে কিছুতেই আর স্থির রাখিতে পারিতেছিলাম না। একটা দম্‌কা হাওয়ার মত ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ্‌ ছাড়িয়া বাচিলাম।

জীবন-নাট্যের একটা অঙ্ক শেষ হইবার পূর্ব্বেই যবনিকা ফেলিয়া দিলাম।

একটু পরেই বরযাত্রি-সহ বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বর দ্বিতীয় পক্ষের হইলেও বয়স তাহার ছল্লিশের উর্দ্ধে নহে, গৌরকান্তি, বলিষ্ঠ দেহ, চোখে উজ্জ্বল-দীপ্তি, সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তাহার নাম নিবারণ, বেনারসে সে কি একটা স্কুলে মাষ্টারী করে। আগের পক্ষের কোন সন্তানাদি নাই। মনে হইল মল্লিকা সুখী হইবে।

নিবারণ কোন দিক্ দিয়াই তাহার অনুপযুক্ত নহে। মল্লিকা যে সুখী হইতে পারিবে ইহা ভাবিয়াও অনেকটা শান্তি পাইলাম।

অনেক রাত্রিতে বেশ নির্ব্বিঘ্নেই নিবারণের সঙ্গে মল্লিকার বিবাহ হইয়া গেল।

শরতের প্রথম বর্ষণের পরে আকাশ যেমন মেঘশূন্য নির্ম্মল হইয়া যায়, শুভদৃষ্টির সময় মল্লিকার মুখখানিও হইল তেমনই হাস্যোজ্জ্বল, মনোরম।

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আর এখন, সামান্য এই সময়টুকুর ব্যবধানেই কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

নারী এমনই রহস্যময়ী বটে!

আমার বুকের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া হৃদপিণ্ডটাকে যেন একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। একটা হৃদয়ে যে কি দারুণ ব্যথার বোঝা সঞ্চিত হইয়া রহিল, এক অন্তর্যামী ব্যতীত কেহই তাহা বুঝিল না!

বাসরঘর হইতে তরুণীদের কল-কোলাহল ও মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিয়া সমস্ত বাড়ীখানি একেবারে মুখর করিয়া তুলিয়াছিল। বার বার মনে হইতেছিল, এমন আনন্দের দিনে আজ নিজেকে কেন এখানে টানিয়া আনিয়াছিলাম! আহারে আর প্রবৃত্তি ছিল না; ভদ্রতার খাতিরে পাতায় বসিতেই হইল আমাকে। হোষ্টেলে ফিরিলাম গভীর রাত্রে। অতীতের ক্ষীণ স্মৃতিগুলি আজ আমার চ'খের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে যেন ব্যঙ্গ করিতেছিল।...

বিনোদ সে'দিন কতকগুলি নূতন লেখা দেখাইতে আনিয়াছিল। দিনদিনই তাহার লেখার উন্নতি হইতেছিল; কাজেই আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাই করিলাম। খুসীতে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। ভোলানাথবাবুর উপর সে'ও বড় কম বীতরাগ নহে। নিজেই সে'দিন তাহার কথা তুলিয়া বলিল—'ভোলানাথবাবুর মত ভদ্রবেশী চামার খুব কমই দেখেছি, মণি। সেদিন তাকে বেশ কড়া কড়া দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে তো কেউ যায় না, যায় তারা কিরণের কাছে। তাই কি একটা কথার পরে 'ভগিনী-প্রেম' বলতেই সে একেবারে চটে আগুন। মুখের উপরেই শুনিয়ে দিলুম—সত্য কথাই বলেছি, তা' নয় তো' আর কি? তারপর থেকে সে আর

আমাদের ওখানে বড় একটা যায় না ; হিরণদি'রা এখানে এসেছে, তাদের কাছেই আড্ডা পেতেছে আবার। এমন ইতরকে ভদ্রপরিবারে মিশ্‌তে দেওয়াই উচিত নয়। এরা স্ূঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়।' বিনোদ ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িতেছিল। একটু পরে সে আবার বলিতে লাগিল—'সুরুচিকে দেখেচ তো ? ছু'-একদিনের আলাপ বই তো নয়, এরি মধ্যে তাকে এক লম্বা চিঠি লেখা হ'য়েছে। সে তো রেগে টঙ্‌। বলে—যেরকম বাঁদরাম করেছে, ওসব লোককে 'হুইপ্‌' করা উচিত। এমনই কত কি ?' সে'দিন রাগের মাথায় বিনোদ আমাকে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিল। ভোলানাথবাবুরও ঠিক্‌ এই অবস্থাই হইয়াছিল সে'দিন। বুঝিলাম—তাহাদের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়ছে ; তাহারই প্রতিক্রিয়া এটা।

সুরুচিকে লইয়া ভোলানাথবাবু যে রকম ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন শেষ পর্য্যন্ত একটা অঘটন কিছু না ঘটিলে সবদিক দিয়াই ভাল হয়।

—ত্রিশ—

শনিবার দিন বেড়াইতে বেড়াইতে রসময়বাবুর বাড়ীর দিকে চলিয়াছিলাম, হিরণ্দি'র সহিত দেখা করিতে। অনেকদিন হইতেই তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুতেই সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না।

আমাকে দেখিয়া রসময়বাবু ও হিরণদি' খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। বিনোদের বাড়ীর ভাইফোঁটার সেই অপ্রিয় ঘটনার পর ইহাদের সঙ্গে এই প্রথম দেখা। আমার খুবই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল; কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

রসময়বাবু তাহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-কৌতুক দ্বারা মুহূর্ত্তে সব জড়তা দূর করিয়া দিয়া বেশ সহজভাবেই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

হিরণদি' জলখাবার ও চা দিয়া গেলেন; খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্পও চলিতে লাগিল। হিরণ'দি ভোলানাথবাবুর কাছ হইতে সব কথাই জানিয়া লইয়াছিলেন! আমি আর বিনোদের বাড়ী যাই না শুনিয়া তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'কিরণ ছেলেমানুষ, তার কথায় রাগ করোনা ভাই! তার হ'য়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, যেয়ো তুমি তাদের ওখানে!'

আমার চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম—'না, না সেজন্য নয়, সময়ও পাই না, ভালও লাগে না, তাই আর ঐদিকে যাওয়া ঘটে ওঠে না। তা' ছাড়া বিনোদ আমার কাছে প্রায়ই আসে, দেখা-শোনা ধর্‌তে গেলে রোজই হয়।'

হিরণদি' হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'বেশ ভাই, শুনে খুব খুসী হলুম যে তুমি রাগ করো নি।'

সে'দিন আর বিশেষ কোন কথা হইল না।

আমি বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মাঝে মাঝে যাইবার জন্য রসময়বাবু অনুরোধ করিলেন।

আমি হাসিয়া সম্মতি জানাইলাম।

হিরণদি' সহাস্যবদনে প্রশ্ন করিলেন—'কবে আসছ আবার?'

আমি উত্তর দিলাম—'তারিখ বল্‌তে পার্‌ছি না, ধূমকেতুর মত সহসাই হয় তো এ কদিন এসে হাজির হ'ব! সন্ধান যখন পেয়েছি, আর কি রক্ষে আছে আপনাদের?'

তাহারা হাসিতে লাগিলেন।...

সে'দিন 'গ্লোবে' গিয়াছিলাম কি একখানি ভাল বই দেখিতে। ভোলানাথবাবুর সঙ্গে সেখানে দেখা হইয়া গেল! তিনি আমারই পাশের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। 'শো' আরম্ভ হইবার তখনও দেরী ছিল।

তাঁহার সহিত গল্প আরম্ভ করিয়া দিলাম।

হিরণদি'র ওখানে যে গিয়াছিলাম, তাহাও তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম।

হঠাৎ একসময়ে ভোলানাথবাবু আমাকে প্রশ্ন করিলেন যে, বিনোদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইয়াছে কি না ?

আমি জানাইলাম—'হ'য়েছিল, সে তার নূতন লেখা দেখাতে এসেছিল।'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার কথা কিছু বল্‌লে না কি ?'

তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম—'বিশেষ কিছু নয় আপনি আর যান না, সে কথাই বল্‌ছিল।'

তিনি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'যাব কি ? ওর মত একটা অভদ্র 'ইডিয়ট' যে, ভাল করে লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না, তার কাছে কি অপমান হ'তে যাব ?'

আমি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলাম।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—'কি, হাস্‌লেনযে ?'

আমি হাসিয়াই জবাব দিলাম—'সে বল্‌ছে আপনাকে অভদ্র, আপনি বল্‌ছেন তাকে। আপনাদের কি হ'য়েছে, আপনারাই জানেন।'

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'সে আমাকে অভদ্র বলেছে না কি ?'

আমি বলিলাম—'না বল্‌লে কি আমি বানিয়ে বল্‌ছি '

'ইডিয়টটাকে আমি এমন শিক্ষা দিতে পারি যে, সে জীবনে ভুল্‌বে না। নেহাৎ বন্ধুত্বের খাতিরেই কিছু কর্‌ছি না। আমায় চেনে না সে, নইলে 'ভগিনী-প্রেম' বুঝিয়ে দিতে পারতুম তাকে। তারই প্যাঁচে, তাকে জব্দ করতুম।' বলিয়া তিনি হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

একটু পরেই 'শো' আরম্ভ হইল, কাজেই আর কোন কথা হইল না।

'ইণ্টারভ্যালে'র সময় ভোলানাথবাবু হাসিয়া বলিলেন—'বিনোদদের সমস্ত 'মিষ্ট্রী' আমি আবিষ্কার করেছি, দরকার হ'লে সব প্রকাশ করে তাকে আমি নাস্তানাবুদ করে ছাড়্‌ব।'

তিনি হাসিয়া উঠিলেন। কি বিকট সে হাসি! আমি চকিত হইয়া উঠিলাম।

'শো' শেষ হইলে বেশ তৃপ্তির সহিতই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

'রসময়বাবুদের ওখানে মাঝে মাঝে যাবেন তো? সেখানেই দেখা হ'বে আশা করি! আচ্ছা গুড্‌বাই।' বলিয়া তিনি বাসে গিয়া উঠিলেন।

হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া মামাবাবুর একখানি চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—'মামীমা গতকল্য একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছেন, নব-জাত শিশু এবং মামীমা বেশ সুস্থই আছেন, কোন চিন্তার কারণ নাই। পরিশেষে জানাইয়াছেন যে, কয়েকদিন হইল—শচীনের মা তাহাদের দেশে চলিয়া গিয়াছে।

মা এবং শচীনের মায়ের সমস্ত ষড়-যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া মামীমার পুত্র হইয়াছে শুনিয়া খুসীতে আমার সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল। শচীনের মা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়াও বড় কম আনন্দ হয় নাই।

—একত্রিশ—

বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম।

মামাবাবুর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম না বটে, কিন্তু মামীমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি আমার কাছে আসিতেন, স্নেহও করিতেন, কিন্তু কি জানি কেন তাঁহার সমস্ত আদর-যত্ন আমার কাছে প্রাণ-হীন বলিয়া মনে হইত।

খোকা দেখিতে খুব সুন্দর এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। মামীমা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—সাধন।

অনেক সাধনা করিয়া খোকাকে পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাহার নাম সাধন রাখিয়াছিলেন।

সুখদার উপরেই সাধনের সমস্ত ভার দেওয়া হইয়াছিল; অবশ্য বেশীর ভাগ সময়ই সে মামীমার কাছে থাকিত। সকালে-বিকালে নিতাই তাহাকে ঠেলা-গাড়ী করিয়া বাগানে একটু বেড়াইয়া লইয়া আসিত; সেইসময়ে মামাবাবু প্রায়ই তাহার সঙ্গে থাকিতেন। মামীমারও সর্ব্বদাই প্রখর-দৃষ্টি থাকিত খোকার উপরে। খোকার একটু কান্না শুনিলেই তিনি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। একটু বেশী বয়সের ছেলে বলিয়াই বোধ হয় সাধন হইয়াছিল তাঁহার নয়ণ-মণি। একদণ্ডও তাহাকে না

দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। নানা আশঙ্কায় তাহার গলায় কতকগুলি মাদুলী ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন; সর্ব্বদাই তাহার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতেন।

এখন হইতেই আমার জীবনের 'ট্র্যাজেডি' আরম্ভ হইয়াছিল। কি জানি কেন, মামীমা আমাকে বেশ একটু সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কারণটা প্রথম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, দুই চারদিনেই কিন্তু সব জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি খোকাকে কোলে লইলে কিংবা তাহার কাছে গেলেই মামীমা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিতেন। বলিতেন—'ও রে রাখ্, রাখ্—ফেলে দিয়ে সর্ব্বনাশ কর্‌বি ?"

আমি কোন প্রতিবাদ করিতে পারিতাম না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া যাইতাম। একটা অসহনীয়-বেদনায় অন্তরটা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। আমি তো সাধনকে কখন হিংসা করি নাই, তবে কেন মামীমা আমাকে এমন সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ? আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া আসিতেছি ! ভুলেও কখন ভাবি নাই যে, সাধনের কোন অহিত করিয়া নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিব ! হায় রে সংসার !

অন্তর ছাপিয়া আমার কান্না আসিত।

মামীমা যখন আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, আমিও পারতপক্ষে তখন সাধনের কাছ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। বেশীর ভাগ সময়ই বাহিরের ঘরে বসিয়া সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া

কাটাইয়া দিতাম ! একা একা বড়ই কষ্ট হইতেছিল ; অন্যবার তবু শচীন থাকিত, তাহার সঙ্গে একরকম করিয়া কাটিয়া যাইত। এবার সে-ও এখানে নাই। তাহার কথা মনে হইলে খুবই কষ্ট হইত ; বেচারার জন্য দুঃখ হইত। ধাপে ধাপে কেমন করিয়া সে পঙ্কিল পথে নামিয়া গিয়াছিল ; কোন উপদেশই তখন সে শোনে নাই। এখন সে কোথায় আছে কে জানে ? মুহূর্ত্তের ভুলে, ক্ষণিকের লালসায় মানুষের যে কি অধঃপতন ঘটে, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শচীন। শুধু সংসর্গ দোষেই সে আজ কোথায় তলাইয়া গেল।

মামাবাবুর সঙ্গে মামীমার প্রায়ই কি সব পরামর্শ হইত। কোন কারণে আমি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের আলোচনাও একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। সময় সময় আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করিত, তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিতাম।

তাঁহাদের ব্যবহারে বিস্ময়ের মাত্রা আমার দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল। শচীনের মায়ের কথা আমার মনে পড়িতেছিল ; এইরূপ একটা ঘটনা যে ঘটিবে, ইহা সে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল ; আমারই বুঝিবার ভুল হইয়াছিল তখন।

মামা-মামীর এইরূপ ব্যবহারে আমি অন্তর-বেদনায় একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছিলাম। সেদিন স্পষ্ট শুনিলাম—মামীমা মামাবাবুকে বলিতেছেন—এবার মণির একটা ব্যবস্থা কর, আর কেন, বি-এ অবধি তো পড়ান হ'ল ; এবার যাক্ না ওর মা-বাপের কাছে। আমার তো এখন সদাই ভয় করে, খোকাকে কখন কি করে' বসে কে জানে ?' মামাবাবু আস্তে আস্তে কি যে জবাব দিলেন, কিছুই বোঝা গেল না।

সেদিন রাত্রে আর দুই চোখ এক করিতে পারিলাম না। নীরব অশ্রু-ধারায় উপাধান একেবারে সিক্ত করিয়া ফেলিলাম।

ছেলেবেলা হইতে সুখদা আমার দেখা-শোনা করিয়া যত্ন লইতেছিল; কাজেই আমার উপর তাহার মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। মামীমার এইরূপ আচরণে সে খুবই দুঃখিত হইত; কিন্তু মামীমার ভয়ে কিছুই বলিতে পারিত না। আমার মন-মরা ভাব দেখিয়া সে একদিন গোপনে আমাকে বলিল—'যে রকম অবস্থা দেখ্‌ছি, এখানে কি ক'রে থাক্‌বে তুমি? মা-বাপের কাছেই ফিরে যাও না? তারা ফেল্‌তে পার্‌বে না কিছুতেই!'

ইহার কোন জবাবই দিতে পারিলাম না।

কথাটা ভাবিবার মতই বটে!

মামীমার মনের কোণে সন্দেহের যে আগুন জ্বলিয়াছে, ইহা সহজে নিবিবে না।

এতদিনের এত আদর-যত্ন ও স্নেহের পর মামীমা যে কি করিয়া আমার বিরুদ্ধে এমন একটা হীন ধারণা পোষণ করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া আমার দুঃখের পরিসীমা রহিল না।

পৃথিবীর সমস্ত নারীই কি এক ছাঁচে গড়া?

কিছুতেই যে ভাবিতে পারি না, মামীমার এত স্নেহ-যত্ন সব মিথ্যা, মেকী! আজই না হয় তিনি সন্তানের জননী, একদিন তো আমাকেই সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। তবে আজ কেন?…

সেদিন কি একটা প্রয়োজনে মামীমার ঘরে গিয়াছিলাম, খোকা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছিল। সে কি একটা সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া আপন

মনেই মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, বড় ভাল লাগিয়াছিল তাঁহার মুখের ঐ মধুর হাসি। আমি তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিতেছিলাম।

সহসা ঝড়ের মত মামীমা সেখানে ছুটিয়া আসিলেন।

আমার দিকে তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন— 'তুই এখানে একা কি করছিস মণি? তোর কি দরকার এখানে?' তাঁহার অনল-বর্ষী দৃষ্টির উত্তাপে আমি একেবারে ম্লান হইয়া গেলাম।

আমি ধীরে ধীরে যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহাতে তিনি মোটেই খুসী হইতে পারেন নাই। তাঁহার চোখ-মুখ রাগে একেবারে ফুলিয়া উঠিতেছিল; তিনি তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত সাধনকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি অপরাধীর মত একটা বুক-ফাটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। অন্তর ছাপিয়া কান্না আসিল। বারবার মনে হইতে লাগিল—মরিতে কেন এ ঘরে আসিয়াছিলাম? মামীমা কি বুঝিলেন কি জানি!

মামীমা মামাবাবুকে কি বলিয়াছেন, কে জানে!

পরদিন দেখিলাম—মামাবাবু সহসা একেবারে গম্ভীর হইয়া গিয়াছেন। অন্যদিন তিনি আমার সঙ্গে কত কথা, কত আলোচনা করেন, সেদিন কিছুই বলিলেন না।

সবই বু কিন্তু উপায় কি?

তাঁহারা যে আমার উপর কেন এমন বীতরাগ হইয়া উঠিলেন, তাহার কারণটা কিন্তু কিছুতেই ঠিক্ ধরিয়া উঠিতে পারিলাম না।

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আর ভাল লাগিতেছিল না; এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম—বৃথা, মামীমা তাঁহাকে যে 'ইন্‌জেক্‌সন্‌' দিয়াছেন, তাহাতে কোনই ফল হইবে না।

মানসিক দুশ্চিন্তায় আমি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলাম। মনে মনে আকাশ-পাতাল কত কি যে ভাবিতেছিলাম, তাহার কিছুই ঠিক্‌ নাই।

হায় রে দুনিয়া! এখানে স্বার্থের জন্য কি-ই না ঘটিতেছে! নহিলে যাঁহারা একদিন আমাকে ক্ষুদিত-হৃদয়ে পুত্র-নির্ব্বিশেষে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ নিজ সন্তান পাইয়া আমাকে এমন অবহেলা, এত হতাদর করিতে থাকিবেন কেন?

ঘৃণায় আমার শরীরটা রি-রি করিয়া উঠিল।

—বত্রিশ—

এভাবে একাকী থাকিতে আমি একেবারে হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলাম। এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল যে, যেখানে হউক কোথাও চলিয়া যাই। আবার কখনও বা মনে হইতেছিল—কর্ম্মের খর-স্রোতে তৃণের মতই নিজে ভাসিয়া চলি।…

মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করিতাম, কোনটাই কিন্তু কাজে লাগাইতে পারিলাম না। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, ঠিক্ করিতে না পারিয়া সন্দেহ-দোলায় দুলিতে দুলিতেই আর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমার বুকে বেদনার তুফান উঠিয়া যে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল, এক অন্তর্যামী ব্যতীত আর কেহই সে দুঃখ বুঝিল না।

সময় কাহার জন্য অপেক্ষা করে না, আমার জন্যও করিল না।

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল ; আমি সসম্মানে পাশ করিয়াছি দেখিয়া খুশীতে আমার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। মামাবাবুও খুব আনন্দিত হইয়াছেন দেখিলাম, তবে মামীমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সেদিন রাত্রে বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া-ছিলাম। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরে নীল আকাশের বুকে অসংখ্য তারকার উপর। তাহাদের দিকে চাহিয়া আপন মনে কত কি ভাবিতেছিলাম!…

সহসা কানে গেল—মামীমা বেশ একটু জোরে জোরেই মামাবাবুকে বলিতেছেন—'আর কেন, যথেষ্ট হ'য়েছে বি-এ পাশ করুল, এবার মণিকে তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমার এখন ওকে ভয় করে, কোন্‌দিন হয় তো দেবে ছেলেটার টুঁটি টিপে!'

মামাবাবু হাসিয়া বলিলেন—'ক্ষেপেছ, অত সাহস ওর হ'বে না। তা' ছাড়া দেখিছি খোকাকে ও খুবই ভালবাসে; যা হ'ক্‌ ঐ রকম ব্যবস্থাই ঠিক্‌ করেছি দু'-একদিনের মধ্যেই ওর মা'র কাছে ওকে পাঠিয়ে দেব।'

মামীমা আর কিছু বলিলেন না।

কথাটা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম, অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তো তাঁহার কাছে কোন অপরাধই করি নাই। তবে কেন, কেন তিনি আমার উপর এমন অমূলক আশঙ্কা করেন!

আর সেখানে বসিতে পারিলাম না। মাতালের মত টলিতে টলিতে নিজের শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। সারা রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া ফেলিলাম। দারুণ অভিমানে আমার মন মামীমার উপর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

ছিঃ ছিঃ মায়াবিনী নারী, এতদিন স্নেহের কি মিথ্যা অভিনয়ই না করিলে! দারুণ বিতৃষ্ণায় আমার সারা অন্তর ভরিয়া গেল।

পরদিন সকালে বাহিরের ঘরে বসিয়া আমি খবরের কাগজ পড়িতে-ছিলাম। মামাবাবু ওপাশে বসিয়া কি কতকগুলি দলিল-পত্র দেখিতে-ছিলেন। একটু পরে তিনি সেগুলি তুলিয়া রাখিয়া আমার পাশে খালি চেয়ারটায় আসিয়া বসিলেন।

আমি একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া নিমেষেই তাঁহার এ আগমনের কারণটা বুঝিয়া ফেলিলাম।

মামাবাবু একটু ইতস্তত: করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'মণি, এবার দিনকতক মার কাছে থেকে, দেখাশোনা করে আয়, পরে যা' হয় ব্যবস্থা করা যাবে'খন।'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'বেশ কালই যাই তা' হ'লে ?'

'আচ্ছা' বলিয়া মামাবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সবই বুঝিলাম ; আমি আর কিছুই বলিলাম না ; একটু পরে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলাম।

পরদিন সকাল হইতেই মামীমা ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন ; আমি যে এত সহজে এখান হইতেই চলিয়া যাইব, একথা যেন তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না ; একটু পরেই তাই তিনি আমার সম্বন্ধে খোঁজ লইতেছিলেন। আমাকে স্থির নিশ্চিন্তভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি মনে মনে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। সুখদাকে পাঠাইয়া বারকয়েক আমাকে তাগাদা করিয়া পাঠাইলেন।

সুখদা আমাকে তাগাদা করিবে কি—আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া সে তো কাঁদিয়াই আকুল। সে আমাকে প্রায় ছেলেবেলা হইতেই মানুষ করিয়াছে, কাজেই আমার উপর তাহার অসীম মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে আমাকে অন্তর দিয়াই ভালবাসিত। আজ বিদায়-ক্ষণে তাহার চোখ দু'টী সজল হইয়া উঠিল, কিছুতেই নিজেকে সে স্থির রাখিতে পারিতেছিল না, আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। অন্তরটা হাহাকার

করিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি, বিদায় যে আমাকে লইতেই হইবে—চলিতে হইবে নূতন পথের সন্ধানে।

সুখদার বিলম্ব দেখিয়া মামীমা নিজেই আসিলেন। তাঁহার চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন—'যা' মণি, চট্ ক'রে নে, যাবার যে সময় হ'য়ে এল!'

আমি মৃদু হাসিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এতদিন মামীমার অফুরন্ত-স্নেহ-ধারা পাইয়া, তাঁহার উপর খুবই মায়া পড়িয়া গিয়াছিল; বিদায়ের সময় যতই নিকটে আসিতেছিল, আমার অন্তরটা কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ততই যেন টন্ টন্ করিয়া উঠিতেছিল। কিসের যে এ মোহ কে জানে

যে সমস্ত স্নেহ-মায়া বিসর্জ্জন দিয়া এমন করিয়া আমাকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই আলেয়ার পিছনেই আমাকে অন্ধের মত ছুটিয়া মরিতে হইবে না কি? কেন, কিসের জন্য?

মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইলাম।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। কিছুই সঙ্গে লইলাম না। সামান্য কয়েকখানা কাপড় ও জামা ছোট সুটকেসটার মধ্যে ভরিয়া লইলাম। মামীমা মনে করিয়াছিলেন, বুঝি এই সুযোগে আমি অনেক কিছু সঙ্গে লইয়া যাইব, তাই তিনি আমার উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে, আমি কিছুই সঙ্গে লইলাম না, তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। নিজেই তখন দুই-একটা জিনিস্ লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আমি সহাস্য-বদনে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করিলাম।

মামাবাবু পথ-খরচের জন্ত গোটা পঞ্চাশেক টাকা সঙ্গে দিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহা হাত পাতিয়া লইতে হইল, উপায় কি?

তারপর মামাবাবু ও মামীমার পদধূলি লইয়া সলজ্জ-চোখে, ব্যথিত-হৃদয়ে নৌকায় গিয়া উঠিলাম। যুক্ত-কর কপালে ঠেকাইয়া মনে মনে বলিলাম—'ঠাকুর, এই যেন আমার শেষ বিদায় হয়, আর যেন এখানে আমাকে ফিরে আস্‌তে না হয়!'

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

—তেত্রিশ—

অনেকটা পথ নৌকায় গিয়া তবে ষ্টীমার ধরিতে হয়। ভাঁটার স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া তামাক খাইতে খাইতে মাঝি আমাকে প্রশ্ন করিল—'বাবু, শচীনবাবুর কোন সংবাদ পেয়েছেন কি?'

সহসা তার এই প্রশ্নে আমার বড় কৌতূহল হইল। আমি হাসিয়া বলিলাম—'তার কোন খবরই তো পাই নি, কেন বল তো?'

সে মনে মনে কি চিন্তা করিয়া একটু পরে বলিল—এম্‌নিই বল্‌ছিলাম। যাবার সময় তিনি আমার নৌকায় গিয়েছিলেন কি না? তেনার সঙ্গে মালতী ঠাকরুণও ছিল। তিনি আমাকে দশ টাকা বক্‌সিস্‌ দিয়েছিলেন।'

ব্যাপারটা এখন একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। শচীনই যে মালতীকে লইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আর রহিল না।

অন্যের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, মা বাবাও কিন্তু এতদিন পরে আমাকে পাইয়া খুসী হইতে পারিলেন না। মা তো স্পষ্টই বলিলেন—'অত বড় জমিদারী ছেড়ে, হুট্‌ করে আস্‌বার কি দরকার ছিল?' ও সব তো তোরই, আজ না হয়, দু'দিন পরে; ঐ পাপটাকে বিদায় কর্‌তে আর ক'দিনই বা লাগ্‌ত।' এমনই কত কি তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন।

আমি ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছিলাম।

বাবা গম্ভীরভাবে বলিলেন—'লেখাপড়া শিখিয়াও না কি আমি মূর্খই রহিয়া গিয়াছি; এ ভাবে সব ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া না কি আমি মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ করি নাই।' ইত্যাদি—অনেক কিছু তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

বুঝিলাম সবই, বলিবার কি-ই বা আমার আছে! সেখানকার কোন কথাই আর প্রকাশ করিলাম না। তাঁহাদের আশার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া লাভই বা কি? আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

মা বলিতে লাগিলেন—'দুদিন থেকে সেখানে চলে যা', তোর ভাবনা কি? রাজার হালে থাক্‌বি সেখানে। তোর পথের ঐ কাঁটাকে আমিই সরাব, সে জন্য কোন চিন্তা নেই তোর!'

মা'র কথা শুনিয়া আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহাকে কিন্তু তাহা বুঝিতে দিলাম না। জোর করিয়া হাসিতে চেষ্টা করিলাম এই রকম একটা হীন আবর্ত্তের মধ্যে থাকিতে আমি একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম।

আমার ভাই-বোনেরা কেহই আমাকে পাইয়া সুখী হইল না। সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, আমি এখানে 'উড়িয়া আসিয়া, জুড়িয়া বসিলাম'। বুঝি বা আর সরিবার নাম করিব না।

এখানেই তাহারা মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছিল। আমি এখানে সত্যই কিন্তু থাকিবার জন্য আসি নাই, মা-বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইব, ইহাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। আর তাহাদেরই বা দোষ দিব কি? শৈশব হইতেই আমি সকলের স্নেহ হইতে বঞ্চিত

হইয়া ভাবী জমিদারীর আশায় এখান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম। কাজেই আমার উপর কাহারও কোনরূপ মমতা ছিল না। নূতন করিয়া যাহাদের আদর-যত্ন-স্নেহ পাইয়াছিলাম, তাঁহারাও আজ আমাকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দূরে সরাইয়া দিল।

আমার এই অভিশপ্ত-জীবনের শেষ কোথায় কে জানে ব্যর্থ বঞ্চিত উপবাসী হৃদয় লইয়া কাঙালের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম; কিন্তু সকলের কাছেই পাইয়াছিলাম—হতাদর ও নিছক অবহেলা, অপমান। বন্ধু বলিয়া যাহাদের আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তাহারাও ছলে-বলে-কৌশলে আঘাতের পর আঘাতই করিয়া আসিয়াছে আমাকে। দুনিয়ায় মানুষ চিনিতে আর আমার বাকী ছিল না। খুব ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলাম, এবং সেইজন্য অনেকটা সাবধানও হইতে পারিয়াছিলাম। থাক্ সে সব বাজে কথা!...

এত অবহেলার মধ্যে এখানে মোটেই আমার আর মন টিকিতেছিল না। মানসিক দুশ্চিন্তায় আমি একেবারে মুস্ড়াইয়া পড়িয়াছিলাম।

এভাবে এখানে থাকা আমার কাছে বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইতেছিল। কিছুতেই নিজেকে এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মিশ খাওয়াইতে পারিতেছিলাম না।

যেমন হঠাৎ একদিন এখানে আসিয়াছিলাম, তেমনিই সহসা আবার একদিন এখান হইতে বিদায় লইতে হইল। মা-বাবা মনে করিলেন, আমি মামার বাড়ীতে যাইতেছি, তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ বুঝি সার্থক হইতে চলিল।...

—চৌত্রিশ—

কলিকাতায় আসিয়া সেই হোষ্টেলেই উঠিলাম। তারপর দুই-চারদিনের মধ্যে একটা ভাল টিউসনী যোগাড় করিয়া একটা মেসে গিয়া ওঠা গেল। মনে করিয়াছিলাম—এম-এ পড়িব, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। আমার দেহ-মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; কাজেই, মা-সরস্বতীর কাছে চির-বিদায় লইলাম '…

এখন হইতে আমার নূতন-জীবন আরম্ভ হইল! ভুলিয়া গেলাম, সংসার-সমাজ বা আমার কোন আত্মীয়-স্বজন আছে। এই যে জীবন-যাত্রা সুরু হইল, কোথায় ইহার শেষ, জানি না!

একটী ছেলেকে দুইবেলা দুই ঘণ্টা পড়াইয়া ত্রিশ টাকা পাইতাম। তাহাতেই আমার বেশ চলিয়া যাইত, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয় হইত। মনের গ্লানি অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল; ধীরে ধীরে অতীতকে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

মনে করিয়াছিলাম—পুরানো কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আর দেখা করিব না, করিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

মানুষ ভাবে এক, কিন্তু হয় আর।

সেদিন পথে হঠাৎ বিনোদের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই, সেই প্রথম আমাকে দেখিয়া 'হ্যালো মণি!'

বলিয়া চীৎকার করিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিল। আমার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানী দিয়া সে বলিয়া উঠিল—'কিরে খবর কি? কবে এলি? কেমন আছিস? একেবারে যে ডুমুরের ফুল হ'য়ে গেলি! আমি তো তোকে খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়রাণ।'

আমি হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম—'তোমার কোন প্রশ্নটার জবার দেব বল? তুমি তো মুখে খই ফুটিয়ে গেলে।'

সেও হাসিতে লাগিল, বলিল—'সব কটারই উত্তর একসঙ্গে দাও।'

দেখিলাম,—আমাকে পাইয়া সে খুব খুসী হইয়াছে। তাহার প্রশ্নগুলির জবাব দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'আজকাল তাহার লেখা কেমন হইতেছে?'

সে সহাস্যবদনে বলিল—'এখন ভাঁটা পড়ে আস্‌ছে; ও আর ভাল লাগে না।' তারপর আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—'কি কর্‌ছ এখন? এম্-এ পড়্‌ছ তো?'

আমি বলিলাম—'এম-এ আর পড়া হ'বে না, আপাততঃ বিশ্রাম কর্‌ছি।'

আমি আর পড়িব না শুনিয়া সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল।

আমার পড়ার ঝোঁক ছিল চিরকালই; আজ আমার মুখে পড়িব না শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া সে আমার কাছ হইতে কারণটা জানিতে চাহিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—'সে অনেক কথা, আর একদিন বল্‌ব।'

সে আর কোন আপত্তি করিল না।

ধীরে ধীরে আমরা সম্মুখদিকে অগ্রসর হইয়া চলিলাম। হঠাৎ এক সময়ে বিনোদ আমার একটা হাত তাহার মুঠার মধ্যে লইয়া অনুনয় করিয়া বলিয়া উঠিল—'মাপ কর ভাই মণি, আমরা আমাদের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি, সত্যি তোমার উপর আমরা অবিচার করেছি। অতীত ভুলে যাও, চল ভাই আবার আমাদের ওখানে।'

ইহার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, কাজেই প্রথমটায় একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া হাসিয়া বলিলাম—'আবার কেন সেই পুরানো কথা তুল্‌ছ বিনোদ? আমি তো কোন কথাই মনে রাখি নি।'

সে আমার দিকে কাতর-দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—'কবে যাচ্ছ তবে আমাদের ওখানে?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'গেলেই হ'ল একদিন।'

তখন আমরা একটা গ্রামোফোন-কোম্পানীর দোকানের সম্মুখে আসিয়াছিলাম। ভিতরে একখানি রেকর্ডে গান হইতেছিল, তাহার মধুর স্বর-লহরী বাহিরের সকলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সকলেই তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল :—

'বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?'

আমি বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিলাম—'শোন্‌ কি চমৎকার গানটা।'

গানটা হইয়াছিল খুব সময়োপযোগী।

মুহূর্ত্তে বিনোদের মুখখানি একেবারে শুখাইয়া গেল; একটু পরে

সে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'বুঝেছি মণি, কি বল্‌তে চাও তুমি। আমার উত্তর হচ্ছে—'এখন ফিরার তারে লাঠির বলে!'

দুইজনেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম।

গল্প করিতে করিতে আমরা অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছিলাম। একসময়ে আমি বিনোদকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভোলানাথবাবুর খবর কি হে? অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

বিনোদ একটু বিরক্তির সহিত জবাব দিল—'তার কথা আর ব'ল না, আমাদের বাড়ী সে ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন; এখন নূতন করে আসন পেতেছে হিরণদি'দের ওখানে। রোজই সে সেখানে যায়, কত ভাব রসময়বাবুর সঙ্গে। কিন্তু কতদিন এ খাতির থাকে দেখি? রসময়বাবুকে চেনে না সে, তার কাছে চালাকি চল্‌বে না। বেফাঁস কোন ইয়ারকি দিলে ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে ফির্‌তে হ'বে বাছাধনকে!' নিষ্ফল আক্রোশে বিনোদ তখনও আপন মনেই গর্জ্জিতেছিল।

তাহার ভাব দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার হাসিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—'আজকাল কোন কাগজেও তো ভোলানাথবাবুর লেখা-টেখা দেখ্‌তে পাই না।'

বিনোদ বলিল—'সত্যি, তা যা বলেছ! বেশ লিখ্‌ছিল হে। প্রেম করতে গিয়েই শেষে একেবারে নিবে গেল। আজকাল একটাও ভাল লেখা কি বেরোয় তার হাত দিয়ে?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এইবার দাঁড়াইয়া বিনোদের কাছে বিদায় লইলাম। সে কাতর-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আবার প্রশ্ন করিল—'কবে যাচ্ছ তবে আমাদের ওখানে?'

তাহাকে ব্যথা দিতে আর ইচ্ছা হইল না। হাসিয়া বলিলাম—'কবে যাব ঠিক্ বল্‌তে পার্‌ছি না, এখন সময় বড় কম। কোন ছুটির দিনে কিংবা রবিবারে একটু সুবিধা হ'লেই যাবার চেষ্টা কর্‌ব।'

সে আর কিছু বলিল না, তাহাতেই রাজী হইল।

একখানা বাস আসিতেই সে ছুটিয়া গিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িল। তারপর সেখান হইতে হাত নাড়িয়া আমাকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

আমিও হাসিয়া ইসারা করিয়াই জানাইলাম যে, সুবিধা হইলেই যাইব।

মুহূর্ত্তে বাসখানা অদৃশ্য হইয়া গেল। আমিও ধীরে ধীরে মেসের দিকে ফিরিয়া চলিলাম! ক্ষীণ স্বপ্ন-শেষের মত আজ অতীতের অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল! হায় রে মোহ!

—পঁয়ত্রিশ—

আঘাত সহিয়া সহিয়া মনটা আমার ক্রমেই কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল ; এখন আর সহজে কাতর হইয়া পড়িতাম না, মামা-মামী কিংবা পিতা-মাতার কাহারও কোন খবরই আর রাখিতাম না—অর্থাৎ রাখা প্রয়োজন মনে করি নাই ; কিন্তু একদিন মামীমার যে অযাচিত স্নেহ পাইয়াছিলাম, তাহা মোটেই উপেক্ষা করিবার নহে। সময় সময় মামীমার জন্য মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিত, কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখিতে পারিতাম না ; স্নেহ-বঞ্চিত বুভুক্ষু-লাঞ্ছিতহৃদয় করুণ-স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত।

ব্যথিত দেহ-মন লইয়া দিনের পর দিন একই ভাবে কাটিয়া যাইতেছিল।

সেদিন রবিবার। কি একটা যোগ ছিল, হঠাৎ খেয়াল চাপিয়া বসিল —গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতে হইবে। কল্পনাটা মাথায় আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই একখানা গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

অসংখ্য নর-নারীতে সমস্ত ঘাটটা ভরিয়া গিয়াছে। পুণ্যলোভাতুর নারীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। আমি একপাশ দিয়া নামিয়া একটা ডুব দিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। অত ভীড় ঠেলিয়া যাইতে আর সাহস হইল না, কাজেই একটু ঘুরিয়া গেলাম।

নারীর রূপ

একটা বস্তীর পাশ দিয়া পথ, কিছুদুর যাইতেই একটা সরু গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল শচীন। তাহাকে দেখিয়াই কিন্তু চিনিলাম। ছিঃ ছিঃ একি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার! কুৎসিৎ ব্যাধিতে সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে। চেহারাখানা শুখাইয়া একেবারে পোড়া-কাঠ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সে শচীন আর নাই; কিছুতেই তাহাকে চেনা যায় না। তাহাকে দেখিয়া এখন করুণা হয় না, হয় শুধু নিদারুণ ঘৃণা। এমনভাবে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই যে তাহার ভাল ছিল।···

আমাকে দেখিয়া সে মোটেই লজ্জিত হইল না; কোকেন-খাওয়া মুখে একগাল হাসিয়া বলিল—'কেমন আছ মণি?' সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পাণের পিচ্ তাহার ঠোঁটের ফাঁক দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ঘৃণায় আমার শরীরটা রি-রি করিয়া উঠিল। গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম—'বেশ আছি।' তারপর একটু থামিয়া কড়া সুরেই তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—'মামাবাবুর অতগুলো টাকার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে কেন? কেন তুমি মালতীকে কুলের বার করে আন্‌লে?'

সে নির্লজ্জের মত হাসিয়া জড়িতস্বরে উত্তর দিল—'সবই তো বাবা তুমি ভোগ কর্‌বে, সামান্য ও ক'টা টাকায় আর তোমাদের এমন কি ক্ষতি হবে? ও টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে। আর মালতীর কথা কি বল্‌ছ তুমি? ভারি সতী-সাবিত্রী কি না সে? আমি না হ'লেও আর কারও সঙ্গে সে তো বেরিয়ে যেতই! কই, এত করে যে নিয়ে এসুম, রইল কি সে আমার কাছে? সুখের প্রাণ তার। রূপ-যৌবন আছে, অনেকেরই শ্যেন-দৃষ্টি পড়ছিল তার উপরে। ফাঁক্ পেয়ে সে পাখী

একদিন উড়ে গিয়ে বস্‌ল কার সোনার খাঁচায়! এখন' তার কোন সন্ধান পাইনি, একবার খোঁজ পেলে হয়, তাকে আমি খুন করব।' বলিয়া সে কট্‌মট করিয়া চাহিল। কি হিংস্র সে চাহনী!

কথা-বার্ত্তায়-আচরণে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই না হইয়াছে শচীনের। কোন কথা বলিতেই তাহার আর বাঁধে না, একটু সঙ্কোচ বোধ হয় না। ছিঃ ছিঃ এমন অধঃপাতে গিয়াছে সে!

বেচারার এ অবস্থা দেখিয়া দুঃখও কম হইল না। তাহাকে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম; বলিলাম—'একটা হাঁসপাতালে চিকিৎসা ক'রে, দেশে মার কাছে চলে যাও'—

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—'তা' আর হয় না মণি! যে বন্ধন একবার ছিঁড়ে এসেছি, সেখানে আর কিছুতেই ফিরে যাব না। এ নরক-যন্ত্রনাই আমাকে ভোগ করতে হবে, এই আমার নিয়তি!' তারপর মনের আবেগে সে অনেক কথাই বলিয়া চলিল। একবার না কি সে শ্রীঘর-বাসও করিয়া আসিয়াছে। পাপের যে আর কতটুকু তার বাকী ছিল, জানি না। তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমারও দুই চোখ ছাপিয়া জল আসিতেছিল; কিছুতেই আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না।

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিতেছিলাম না। পা দুইটাকে সম্মুখ দিকে চালাইয়া দিলাম।

শচীন ছুটিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত পাতিয়া বলিল—

নারীর রূপ

'কিছু দিয়ে যাও মণি, আজ দু'দিন কিছু খাইনি।' তাহার চোখে কাতর-দৃষ্টি।

ট্রাম ভাড়ার চারিটা পয়সা রাখিয়া যাহা ছিল, সব তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম। খুসীতে তাহার মুখখানা উজ্জল হইয়া উঠিল।

তাহার দিকে আর ফিরিয়া চাহিলাম না। বেগে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।...

ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সহসা আমার সম্মুখ দিয়া একখানি ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেল; দেখিলাম—ভোলানাথবাবু ও সুরুচি পাশাপাশি বসিয়া আছে। নিজের চক্ষুকে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। এও কি সত্য? এই সুরুচিই না একদিন ভোলানাথবাবুকে 'হুইপ' করিতে চাহিয়াছিল? আর সেই কি না শেষে তাহার পাশে বসিয়া আমার চক্ষুতে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়া গেল। এই জন্যই বুঝি কবিরা বলিয়াছেন—নারীকে বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই, তাহার এক চক্ষুতে সৃষ্টির, আর এক চক্ষুতে সংহারের রূপ।

আমার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। ট্রাম আসিয়া পড়িল; গাড়ীতে উঠিয়া তাহাদের কথাই ভাবিতেছিলাম। উঃ কি ভয়ঙ্কর লোক এরা!

মেসে আসিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম; তখনও রহিয়া রহিয়া শচীন ও উহাদের কথাই বায়স্কোপের ছবির মত আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

শচীন কি ছিল, আর এখন কি হইয়াছে ? পথের কুকুরের অপেক্ষাও অধম, হীন ! ঘৃণায় সমস্ত দেহ-মন বিষাক্ত হইয়া ওঠে !

আর বিনোদ ও ভোলানাথবাবুর ব্যাপারটা সবই একটা রহস্যের আবরণে ঢাকা। সব বুঝিয়াও কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মুহূর্ত্তে সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়। শূন্য মরুভূর বুকে যেন একটা আলেয়া।...

—ছত্রিশ—

মনে করিয়াছিলাম—কাহার কথাই আর ভাবিব না ; একে একে সকলকেই ভুলিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু বিনোদের ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলাম না ; একটা দুষ্টব্রণের মতই মনটা সর্ব্বদা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিত। মনে হইত—তাহারা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেছিল ; কিছুতেই ধরা দিতে চাহিত না। কেন এ ছলনা কে জানে'

কিছুদিন পরের কথা।

সেদিন গোলদীঘির কাছে রসময়বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি ছাড়িলেন না, জোর করিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন।

কি করিব ? অনিচ্ছাসত্বেও ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইল।

হিরণদি' ভোলানাথবাবুর সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন, আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। খুটিয়া খুটিয়া আমার অনেক কথাই তিনি জানিয়া লইলেন। পরে একসময়ে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন—'তোমার কি কোন অসুখ করেছে মণি ? বড্ড যে রোগা হ'য়ে গেছ !

আমি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলাম—'কই, কিছুই তো টের পাচ্ছি না, তবে যদি মনের কোন অসুখ হ'য়ে থাকে, তা বল্‌তে পারি না !'

তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল,—আমার উত্তরে তিনি খুব খুসী হ'ন নাই ; গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'ঠাট্টার কথা নয় মণি, বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছ, একজন ডাক্তারকে একবার দেখান ভাল !

তাহার এ' স্নেহের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার নহে ; আমি শান্ত-স্বরে জবাব দিলাম—'আচ্ছা, দেখাব একবার !'

একটু পরেই হিরণদি' পরিপাটী করিয়া প্রচুর জলখাবার আনিয়া দিলেন। ভোলানাথবাবু, রসময়বাবু ও আমি তিনখানি ডিস্ তুলিয়া লইয়া দক্ষিণহস্তের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হিরণদি' আবার এক-একটা মিষ্টি পাতে তুলিয়া দিতেছিলেন ; কোন আপত্তিই শুনিতেছিলেন না। পরম পরিতোষ-সহকারে আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ওঠা গেল।

রাত্রি হইয়াছিল ; সেদিনকার মত বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে আসিবার জন্য হিরণদি' বার বার অনুরোধ করিলেন !

ভোলানাথবাবুও আমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিলেন। আজ এখানে তাহার সহিত আমার বিশেষ কোন কথাই হয় নাই ; সারাক্ষণ তিনি গম্ভীর ভাবেই ছিলেন ; প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও বলেন নাই।

গোলদীঘির কাছে আসিতেই তিনি বলিলেন—'আসুন মণিবাবু, একটু বসা যাক্ এখানে।'

তাঁহার এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না ; পিছন পিছন গিয়া একটা নিরিবিলি যায়গা দেখিয়া বসা গেল।

ভোলানাথবাবুই সর্ব্বপ্রথম কথা বলিলেন—'কেমন লিখ্‌ছেন আজকাল ?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'লিখ্‌ছি আর কই? এখন সে উৎসাহ একেবারে গেছে!'

'এরি মধ্যে উৎসাহ চলে গেল?' বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন; তারপর আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—'ছাড়্‌লে চল্‌বে কেন? নতুন উৎসাহে ভাল করে লিখুন!'

আমিও একটু হাসিলাম, কি আর জবাব দিব?

একটু পরে তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—'বিনোদের সঙ্গে আর দেখা হ'য়েছিল? কি বলে ও?'

আমি বলিলাম—'দেখা হ'য়েছিল কিছুদিন আগে। সেই পুরানো কথা তুলে আমার কাছে ক্ষমা চাইলে, বল্‌লে—চল ভাই, আমাদের ওখানে আবার, আমাদের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ওপর অবিচার করেছি ইত্যাদি ও অনেক কথা বলেছে!'

মুহূর্ত্তে ভোলানাথবাবুর মুখখানা একেবারে গম্ভীর হইয়া গেল; তিনি বলিলেন—'সে একটা 'কাওয়ার্ড' সত্যকথা বল্‌বার শ-ি তার নেই! আমার কাছে সে কি বলেছে জানেন? সে বলেছে—আমি ছাড়া নাকি আর কারও স্থান সেখানে হবে না। আমার কাছেই বা ধরা পড়ে গেছে, আর কাউকে সে ধরা দেবে না! একদিন বলেছিলুম না আপনাকে, আমার সঙ্গে বিবাদ করতে সে সাহস পাবে না, অত বড় মনের জোর তার নেই। আমি তাকে খুব ভাল ক'রেই চিনে ফেলেছি। তাদের সমস্ত নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি।'

আত্ম-গর্ব্বে তাঁহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; অধরকোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। এত বড় ভয়ঙ্কর লোকও থাকিতে পারে? এমন লোককে শয়তান ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

তাহাদের বাড়ী না যাওয়ার জন্য কোন দুঃখ হয় নাই।

অনেকদিন হইতেই যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাদের উপর আর কোন মোহই ছিল না আমার। কিন্তু এমন করিয়া আমার সঙ্গে চালাকী করিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহার? আমি তো তাহার কোন ক্ষতিই করি নাই। ছিঃ ছিঃ! মানুষ এত নীচ হইতে পারে? দারুণ ঘৃণায় আমার মনটা ভরিয়া উঠিল!

ভোলানাথবাবু বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—'বিনোদের এ ব্যবহারে আমি মোটেই সুখী হই নি, কিন্তু কি করব? এবার আমিও একদিন কেটে পড়ব। দিনকতক ওদের নিয়ে খুব ছিনিমিনি খেলা গেল যা হ'ক। ওদের ভুল ধারণা, আমি ওদের সঙ্গে মোটেই প্রেম করতে যাইনি। ওরা কেউ আমার প্রেমিকা হবার যোগ্য নয়। ওদের তিন জনের গুণ যদি কোন একজন নারীতে পাই, তবে হয় তো তার সঙ্গে আমার প্রেম হ'তে পারে। আমার প্রেমিকার তনু হবে—কিরণের মত,—চোখ হ'বে—হিরণের মত মাদকতা ভরা দীপ্তিময় আর গলার স্বর হবে—সুরুচির মত মিষ্টি। এমন যদি কেউ থাকে, তবেই তার সঙ্গে আমার প্রেম চলবে।'

তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্রান্ত দেহ মন লইয়া আমিও ধীরে ধীরে মেসের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। সমস্ত পথটা ইহাদের কথাই ভাবিতেছিলাম।

—সাইত্রিশ—

মেসে ফিরিয়া সেদিন মনে মনে অনেক কথাই ভাবিলাম, কিন্তু কিছুতেই ঠিক করিতে পারিলাম না যে, আমি বিনোদের এমন কি ক্ষতি করিয়াছি। বার বার সে আমাকে অপমানিত করিতেছে! এমন করিয়া যে সকলের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতেছি, এ জন্য দোষ অবশ্য কাহাকেও আমি দি-ই না; কারণ, জানি—এই আমার নিয়তি, অভিশপ্ত জীবনের হাহাকার!···

সমস্ত মন তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় থাকিতে আর মোটেই ইচ্ছা হইতেছিল না। এখানকার বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মিশিবার ভয়ে, একপ্রকার আমি আর মেসের বাহির হইতাম না। 'টিউসনি' করিয়া আসিয়া সেই যে ঘরে ঢুকিতাম, আর বাহিরে যাইতাম না। একাকী সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া বাকী সময়টা কাটাইয়া দিতাম। কয়েক দিনেই কিন্তু একেবারে হাঁপাইয়া উঠিলাম। এ' নির্জ্জন নির্ব্বাসন আর ভাল লাগিল না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মত বাহিরে যাইবার জন্য সর্ব্বদা ছটফট্ করিতাম।···

সেদিন পড়াইতে গিয়া শুনিলাম—ছাত্র কোথায় নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। পড়ান হইবে না, কাজেই ফিরিয়া আসিতেছিলাম; সহসা আমার দৃষ্টি পড়িল—সম্মুখে সংবাদ-পত্রখানির উপর। বিশেষ কোন কাজ

ছিল না ; তাই, পত্রিকাখানি পড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বসিয়া পড়িয়া কাগজখানির উপর চোখ বুলাইতে লাগিলাম। কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনগুলি পড়িতে পড়িতে একটা স্থান দেখিয়া মনে মনে ল্লসিত হইয়া উঠিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—কাশীতে কোন একটী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের জন্য একজন বি-এ পাশ শিক্ষক চাই, বেতন চল্লিশ টাকা ; স্থায়ী হইলে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা আছে।

নোটবুকে ঠিকানাটা টুকিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মনটা আশার আলোয় খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত পথটা চলিতে চলিতে কত আকাশ-কুসুমেরই না সৃষ্টি করিতেছিলাম।

এক বুক আশা লইয়া দিন গুলিতে লাগিলাম। বহুদিন আমার প্রেরিত দরখাস্তের উত্তর না পাইয়া যখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন একদিন হঠাৎ কাশী হইতে সেই স্কুলের হেড্-মাষ্টারের একখানি চিঠি পাইলাম। তিনি জানাইয়াছেন—সমস্ত দরখাস্তের মধ্যে আমার খানাই নাকি মঞ্জুর হইয়াছে। আগামী মাসের পহেলা তারিখে আমাকে কাজে যোগদান করিতে হইবে। ফেরৎ ডাকেই আমার মতামত জানাইতে বলিয়াছেন।

এত বড় আনন্দ জীবনে কখনও পাই নাই। মনে মনে খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। সেদিনেই পত্রের জবাবে জানাইলাম—পহেলা তারিখে আমি নিশ্চয় কাজে যোগ দিব।

নিয়োগ-পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন চলিয়া গিয়াছিল কাশীতে। সারা রাত শয্যায় পড়িয়া স্বপ্নজাল বুনিয়া কত মায়াপুরীই না রচনা করিতাম।

কিন্তু আমার ছাত্রের উপর কেমন একটু মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে আমাকে খুবই ভালবাসিত। তাকে ছাড়িয়া যাইতে মনের কোণে একটু বেদনা গুমরিয়া উঠিল। শস্য-শ্যামলা ছায়া-শীতল মায়াবী গ্রামখানিতে আমার সুখ-দুঃখের কত স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। বিদায়ক্ষণে একে একে সেইগুলি আমাকে ব্যথাতুর, চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। নিকটতম আত্মীয়ের সমস্ত আঘাতগুলি যেন আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছিল

—আটত্রিশ—

কোন স্মৃতির আকর্ষণই আমার মনকে টলাইতে পারে নাই।

আজ আমার কাশী চলিয়া যাইবার দিন। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম—বোম্বাই মেলে যাইব। খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য কিছু জিনিস কিনিতে বাহির হইয়াছিলাম। যাইবার সময় ট্রামে ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি ঐ গাড়ীতেই ছিলেন। তিনি তাঁহার পাশে বসিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি মৃদু হাসিয়া বসিয়া পড়িলাম।

দেখিলাম—তাঁহার হাতে বিনোদ, কিরণ, সুরুচি ও তাঁহার নিজের একত্রে একখানি বাঁধানো গ্রুপ ফোটো রহিয়াছে। সেখানির উপর আমার কৌতুহল-পূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া তিনি সহাস্যমুখে আমার হাতে সেখানি তুলিয়া দিয়া বলিলেন—'এক সঙ্গে সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে এখানি তোলা গেল। একটা স্মৃতি রাখা ভাল' বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

একবার চোখ বুলাইয়াই সেখানি তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিলাম। বুঝিলাম—তাঁহাদের মধু মিলন আজকাল তবে খুব জোরেই চলিয়াছে।

ভোলানাথবাবু অধরকোণে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিলেন—'আপনার কথা মাঝে মাঝে ওঠে। বিনোদের চেয়ে কিরণই মনে হয় আপনার ওপর বেশী চটা। আপনার অজস্র নিন্দে করে। তা' বিনোদও বড় কম যায় না।'

ইহার আর কি জবাব দিব? শুধু একটু হাসিলাম। মনে মনে বুঝিলাম—আমি এখন সমস্ত নিন্দা কিংবা প্রশংসার অতীত। কোন নিষ্ঠুর আঘাতই আর আমাকে ব্যথা দিতে পারিবে না।...

তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া নামিয়া পড়িলাম।

মুক্ত বিহঙ্গের মতই একটা অপরিসীম আনন্দে আমার সারা অন্তর ভরিযা গিয়াছিল। চারিদিক হইতে আঘাত পাইয়া আমার মন এ:ক-বারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আজ ট্রেণে উঠিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিতেই আমি মনে মনে বলিলাম—বিদায় বঙ্গ জননী, বিদায়। আর যেন আমাকে তোমার স্নেহহীন ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতে না হয়!

সমস্ত রাত ঘুমাইতে পারি নাই। একে একে কত কথাই মনে পড়িতেছিল। রহস্যময়ী নারীর কত রূপই দেখিলাম! আমার হাসি পাইল!

পরদিন সকালে কাশীতে পৌছিলাম।

হেড্মাষ্টার মহাশয় খুব সদাশয় ব্যক্তি। হোষ্টেলে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্কুল এবং ছাত্র সম্বন্ধে তিনি অনেক সদুপদেশ দিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিলাম, যাঁহার স্থানে আমি নিযুক্ত হইয়াছি, তাঁহার খুব অসুখ বলিয়া তাঁহাকে আপাততঃ তিন মাসের ছুটি দেওয়া হইয়াছে। তবে তাঁহার কাজে যোগ দিবার সম্ভাবনা খুব কম। তাঁহার নাম নিবারণ, সে নাকি 'থাইসিসে' ভুগিতেছে। সে যোগ না দিলে, আমি নাকি এই কাজে একেবারে পাকা হইয়া যাইব।

নিবারণ নাম শুনিয়া আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম; নামটা যেন

চেনা চেনা বলিয়া মনে হইল, কিন্তু কিছুতেই স্মরণে আনিতে পারিলাম না।

যেই-হোক্ সে, আহা বেচারী। তাঁহার জন্য বড় দুঃখ হইল। আত্মীয়-বান্ধবহীন এই বিদেশে কেমন আছে সে, কে তাহার দেখা শোনা করিতেছে, কে জানে ?...মনে মনে বলিলাম—এমন চাকুরী আমি চাহি না, সে তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিয়া তাহার কাজ করুক।...

দু'দিনেই ছাত্রের দল আমাকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল—অন্তর দিয়া আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আমার বয়স অল্প বলিয়াই হোক্ বা আমি সমস্ত জিনিসই কিছু জানিতাম বলিয়াই হোক্ তাহারা আমাকে চাহিত, তাহাদের সমস্ত কার্য্যে আমার ডাক পড়িত।

ইহাতে অন্যান্য শিক্ষকেরা খুব খুসী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রদের সহিত এ ভাবে মেলামেশা করা তাঁহারা ভাল মনে করেন নাই, মনে মনে খুব বিরক্ত হইতেন বলিয়াই মনে হইত। অবশ্য আমাকে তাঁহারা কিছু বলেন নাই। তাঁহারা এতদিন ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়া ছাত্রদের যে শ্রদ্ধা, ভালবাসা পান নাই, আমি দু'দিন আসিয়া এত সহজে তাহা কি করিয়া অর্জ্জন করিলাম তাহা ভাবিয়া তাঁহারা বিস্মিতও কম হন নাই।...

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। আমার এ ভাবে মেলামেশায় তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ছেলেদেরও তিনি উৎসাহ দিতেন। বিশেষতঃ আমি ছেলেদের দ্বারা 'নারায়ণী' নাম দিয়া একখানি হস্তলিখিত মাসিক-পত্র পরিচালনা করিয়াছি শুনিয়া হেডমাষ্টার

মহাশয় আমার উপর আরও সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকদিন হইতে তাঁহারও এমনই একটা অভিলাষ ছিল। তাই শীঘ্রই তিনি কাগজখানি ত্রৈমাসিক করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অবশ্য এইজন্য আমাকে অনেক খাটিতে হইত। ছাত্রদের আনন্দ এবং উৎসাহ দেখিয়া আমার কিন্তু কোন কষ্ট বলিয়াই মনে হইত না।

—উনচল্লিশ—

সেদিন কি একটা ছুটির দিন। সকালবেলা গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম। তখনও বেশী বেলা হয় নাই, ভাবিলাম—একবার মণিকর্ণিকার ঘাটটা ঘুরিয়া আসি। প্রভাতী সূর্য্যের সোনালী অরুণ আলো এবং গঙ্গার সুশীতল সমীরণ বড় ভাল লাগিল; শরীরের সমস্ত অবসাদ দূর হইয়া অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল।

দূর হইতে বহুলোকের ভীড় দেখিয়া কেমন কৌতূহল হইল। তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, কলিকাতার কোন বায়স্কোপ কোম্পানী ফিল্ম তুলিতেছে। দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম; অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে সহসা ভোলানাথবাবু ও সুরুচিকে দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পাশের এক ভদ্রলোক আর একজনকে বলিতেছিলেন—'ভোলানাথবাবুর নিজেরই লেখা 'বৈজয়ন্তী' বই তোলা হচ্ছে, তিনি নিজেও এতে এ্যামেচারভাবে অভিনয় করছেন। প্রধানা নায়িকার পার্ট করছে সুরুচিবালা আশা করা যায় বইখানা ভালই হবে। একখানা বইয়ে অভিনয় করেই কিন্তু এ খুব নাম্ করেছে।'

হায়! ইহাও শেষে চোখে দেখিতে হইল! আর সেখানে দাঁড়াইলাম না! তাড়াতাড়ি দশাশ্বমেধঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম!

অনেক কথাই আজ মনে হইল। এই সুরুচিবালাই না একদিন ভোলানাথবাবুকে 'হুইপ' করিতে চাহিয়াছিল? তারপর কত কাণ্ড

হইল, কতদিন দুইজনকে একত্রে মোটরে দেখিলাম; শেষে কি না নায়িকা সাজিয়া অভিনয় পর্য্যন্ত…বাঃ! আমার হাসি পাইল। ছলনাময়ী নারীর কত লীলা-খেলাই না দেখিলাম!…

স্নান করিয়া হোষ্টেলে ফিরিতেছিলাম। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবার গলিটার সম্মুখে আসিতেই পিছন হইতে চির-পরিচিত কণ্ঠের ডাক্ আসিল—'নতুন ঠাকুর-পো!'

চমকিত হইয়া পিছন ফিরিতেই দেখি—বৌদি,' সঙ্গে কে একজন অপরিচিতা বিধবা। হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

বৌদি' সহাস্যমুখে, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'সাম্‌নেই, গনেশ মহলায় আমাদের বাসা, এসো ভাই, সেখানে গিয়েই সব কথা বল্‌ব ও শুনব'খন!'

তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না, সম্মতির হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। দশাশ্ব-মেধ ঘাটের নিকটেই তাঁহাদের বাসা। বেশ ছোটখাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়ীটী। আমাকে নীচের একটী ঘরে বসাইয়া বৌদি' বাড়ী'র ভিতর চলিয়া গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিতা মহিলাটীও গেলেন।

চুপ্ করিয়া বসিয়াছিলাম। কত কথাই মনে হইতেছিল, যাহাদের ভয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিলাম, এখানে আসিয়া আবার তাঁহাদের সঙ্গেই একে একে দেখা হইয়া যাইতেছে। বিধাতার কি নিদারুণ পরিহাস!

একটু পরেই বৌদি' ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিয়া কহিলেন—'তারপর নতুন ঠাকুরপো, হঠাৎ কাশী কি মনে করে? কবে এলে? কোথায়

আছ তুমি? কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা! কার মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ কে জানে?'

বৌদির প্রশ্ন করিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম—'বাঃ থাম্‌লেন কেন? আর কিছু কি জান্‌বার নেই?'

তিনিও হাসিতে হাসিতে বাব দিলেন—'জানবার আছে তো অনেক কিছুই, তবে যে কটা চেয়েছি, তারই জবাব আগে দাও দেখি ভাই!'

'বেশ' বলিয়া আমিও হাসিতে হাসিতেই কহিলাম—'প্রায় মাস দুই হ'ল এখানে এসেছি, হোষ্টেলে থেকে একটা স্কুলে মাষ্টারী করি। তারপর আপনাদের কি খবর?'

বৌদি' জবাব দিলেন—'আমাদের আর কি খবর? মা ভুগ্‌ছিলেন, একটু ভাল হতেই ডাক্তারের পরামর্শে চেঞ্জে এসেছি। তা' তুমি হঠাৎ মাষ্টারী কর্‌তে এলে যে?'

আমি হাসিয়া বলিলাম—'সুখানি চ দুঃখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে।'

বৌদি' হাসিয়া বলিলেন—'তা মশায়ের কি দুঃখ হ'ল আবার! বাড়ী থেকে রাগ করে এসেছ বুঝি?'

আমি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম—'কার সঙ্গে আর রাগ কর্‌ব বলুন?'

'ও! এখনো বিয়ে হয় নি বুঝি, তা'ও তো বটে!' বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

একটু পরেই সেই বিধবা মহিলাটী একখানা থালায় কতকগুলি গরম লুচি, বেগুন ভাজা ও হালুয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বৌদি' বলিলেন—'এই আমার বড়দি'।'

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি দুই একটা কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন; কারণ, তিনি রান্না চাপাইয়া আসিয়াছেন।

বৌদি' আমার পাশেতেই মেঝেতে বসিলেন। খাইতে খাইতে তাঁহার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প চলিতে লাগিল। মনে করিয়াছিলাম, কিরণদের কথা আর উঠিবে না; কিন্তু বৌদি' নিজেই তাহা তুলিলেন। বলিলেন—'তোমার ওপর তারা খুব অন্যায় ব্যবহার করেছে; কি করব ভাই, আমার ত' কোন হাত ছিল না। এখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে খুব অনুতপ্ত হ'য়ে প'ড়েছে। দেখ না, আমার কাছে কেমন চিঠি দিয়েছে, যাই, নিয়ে আসি সেখানা—' বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। বৌদি' পাণ এবং কিরণের লেখা পত্রখানা লইয়া আসিলেন; বলিলেন—'পড়ে দেখ, কি লিখেছে।'

পাণ চিবাইতে চিবাইতে পত্রখানির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। কিরণ লিখিয়াছে :—

'ভাই মেজ'বউদি,'

অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাই নি। মা-ঐমা আজকাল কেমন আছেন জানিও। এখানে আর সকলেই ভাল আছে, আমার মানসিক অবস্থা বড়ই চঞ্চল! মণিবাবুর ওপর সত্যই আমি খুব অন্যায় ব্যবহার করেছি। আমার ভুল এখন বুঝ্‌তে পেরে নিজেই জ্বলে-পুড়ে মর্‌ছি। দুঃখ হয়, কেন তখন তোমার উপদেশ শুনি নি। সত্যি, তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন, কোন প্রকার বদ্‌মতলবে আমাদের এখানে আস্‌তেন না। ভোলানাথবাবুর গল্প ও তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলি

মিথ্যে কথা শুনেই তাঁর ওপর চটে গিয়েছিলুম, মন একেবারে বিষিয়ে উঠেছিল। আজ তিনি কোথায় আছেন জানি না। ছোড়দা'কে দিয়ে তাঁর খোঁজ করেছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাই নি। যদি দেখা পেতুম, করযোড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতুম। ছোট বোনের ওপর তিনি কখন' রাগ রাখ্‌তে পার্‌তেন না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাক্‌, অনেক বাজে কথা লিখে ফেল্‌লুম, কিছু মনে করো না তুমি; আমার প্রণাম নিও এবং মা-ঐমা ও বড়দি'কে দিও। ইতি

তোমার কিরণ।'

পত্রখানা পড়িয়া বেদনাতুর হইয়া পড়িলাম। কিরণের ছল ছল নয়ন ছ'টী যেন আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া আমাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

সেদিন আর কোন কথাই হইল না। আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া বৌদি'ও আর কোন প্রশ্ন তুলিলেন না।

বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। মাঝে মাঝে আসিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন।

তাঁহার অনুরোধ উপক্ষার নহে। আমি স্মিতমুখে বলিলাম—'আপনার স্নেহ ত' ভোলবার নয়, নিশ্চয় আস্‌ব বৌদি?'……

বুকের মধ্যে তুফান উঠিয়াছিল। সারা পথটা উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া চলিলাম; সমস্ত অতীত যেন আজ আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া আমাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। মাথাটা কেমন গোলমাল হইয়া গেল।

—চল্লিশ—

সেইদিন বিকালে সেকেণ্ড মাষ্টার আসিয়া বলিলেন যে, তিনি নিবারণবাবুকে দেখিতে গিয়াছিলেন ; তাঁহার অবস্থা নাকি খুব খারাপ, রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ। ডাক্তারে শেষ জবাব দিয়া গিয়াছে !

নিবারণের জন্য মনটা কেমন করিয়া উঠিল। তাহার বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য মনস্থ করিলাম।

বিকাল হইতেই সমস্ত আকাশটা কাজল কাল মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই ঝড়ের মাতামাতি সুরু হইয়া গেল। উন্মাদ পবন গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল ; কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া নিষ্ফল আক্রোশেই যেন গুমরিয়া মরিতেছিল।

সকাল সকালই আমাদের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছিল, যে যাহার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমি 'নারায়ণী'র অর্ডায় প্রুপ্‌গুলি দেখিতে লাগিলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার প্রুফ দেখা শেষ হইল। তারপর 'পূরবী' হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। একটা স্থান খুব ভাল লাগিল ; সেখানটা আবার পড়িতে লাগিলাম—

'খোলো, খোলো, হে আকাশ স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারাণো কণিকা।

নারীর রূপ

কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জন শূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা ?'

বার বার পাঠ করিয়াও আশা মিটিতেছিল না। মনে হইল কবিগুরু যেন আমার জীবন লইয়াই এই কবিকা লিখিয়াছেন। ইহার প্রতি ছত্রে আমার মর্ম্মবাণী লেখা রহিয়াছে।

হঠাৎ নীচে কিসের গোলমাল শুনিয়া আমার তন্ময় ভাবটা কাটিয়া গেল। কান পাতিয়া শুনিলাম—পাঁড়েজির গলা। সে ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাহাকে বলিতেছে—'কোন্ হ্যায় ? কিস্‌কো মাংতা ? কেয়া ?'

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া শুনিলাম—ব্যাকুল নারীকণ্ঠে কে বলিতেছে—'ওগো, মাষ্টার মশাই কাউকে ডেকে দাও, আমার বড় বিপদ !'

এ'যে আমার চির-পরিচিত কণ্ঠের স্বর। ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। যাহা ভাবিয়াছি, ঠিক্ তাহাই, মল্লিকা দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। তখনই পুরানো দুটী চোখ্ আমার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল—বিশ্বাস, সরলতা ও প্রীতিঢালা ডাগর ডাগর চোখ দুটী, কাল তারা, ঘন কৃষ্ণ পল্লব, স্থির দৃষ্টি ! সহসা আমার হৃদপিণ্ডটায় সজোরে কে আঘাত করিল, দারুণ বেদনায় ভিতরটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। উঃ ! দেখা দিলেই যদি, এমন করিয়া দিলে কেন পাষাণী ?...

কে জানিত তখন যে, এই নিবারণই মল্লিকার স্বামী। এত নিকটে থাকিয়াও তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিতে পাইলাম না।

ঝড় তখন থামিয়া গিয়াছে। কয়েকজন মাষ্টারের সাহায্যে নিবারণের হিমশীতল শবদেহ দাহ করিতে লইয়া গেলাম।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গেল।...তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক পরিয়া আবার হাসিয়া উঠিল।...

মল্লিকাকে আজ এ কি বেশে দেখিলাম!

শুভ্র-শুচি পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্থির, নিশ্চল, সে যেন এক রাশ ঝরা শেফালী! তাহার দিকে আর চাহিতে পারিলাম না। আমার অন্তর আর্ত্তনাদ করিয়া উটিল। উঃ কেন, কেন আমি মরিতে কাশী আসিয়াছিলাম!...

মল্লিকা আমার দিকে চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—'তুমি আমায় কল্‌কাতায় রেখে আস্‌তে পার্‌বে না মণিদা' ?'

আমি বলিলাম—'পার্‌ব।'

'তবে চল, এখনই ঠিক্ হয়ে নিতে হবে' বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।...

ট্রেণ ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইখানি বেঞ্চে দুইজনে বসিয়াছিলাম, কাহারো মুখে কোন কথা নাই।

অদূরে টেলিগ্রাফের তারের উপর কতরকম ছোট ছোট পাখী বসিয়া আছে। সেইদিকে চাহিয়া আমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। অতীতের কত কথাই আজ মনে পড়ে। দুইটী হৃদয়ে তুফান উঠিয়া আজ যে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল, এক অন্তর্য্যামী ব্যতীত আর কেহই তাহা বুঝিল না।...

বার বার মনে হইতেছিল—হায়, এই তো স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, করুণাময়ী নারীর রহস্যভরা জীবনের মর্ম্মন্তুদ অবসান ! সমস্ত জীবনটাই যেন একটা অভিশাপ, হাহাকার !...

আমার ব্যর্থ, বঞ্চিত, পিয়াসী হৃদয় যেন বার বার আঘাত পাইবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিল। কবে যে এ জীবন নাট্যের শেষ যবনিকা পড়িবে, তাহা কে জানে !

* * *

মল্লিকা একদৃষ্টে জানালার দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চোখের তারা দুইটী স্থির, নিশ্চল। যেন সে এখানে ছিল না, শুধু তাহার দেহটাই পড়িয়াছিল এখানে।

সহসা তাহার মুখখানি একটা উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে আমার পাশে উঠিয়া আসিয়া মিনতিভরা-কণ্ঠে বলিল—'মণিদা,' তোমার কাছে জীবনে কিছু চাই নি, আজ আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে ?'

আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম, বলিলাম—'বলো মল্লিকা, সম্ভব হ'লে নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রাখ্‌বো !'

সে মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, তারপর ধরা গলায় বলিল—'আমি জানি, তুমি আমায় কত ভালবাস ! আমার জন্য তোমার হৃদয়ে কত ব্যথা সঞ্চিত হয়ে আছে ! তোমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হতে চলেছে ! আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, তোমার কাছে প্রাণভরে' ক্ষমা চেয়ে নেবো। বলো—আমায় তুমি ক্ষমা করেছ ! জীবনে হয় তো আর আমাদের দেখা হবে না, এই তো শেষ ! বলো—তুমি আমার জন্য আর ভাব্‌বে না, চিরদিনের

মতো আমার স্মৃতি মুছে ফেল্‌বে? তুমি বিয়ে করো এই আমার শেষ অনুরোধ! তোমাকে সুখী দেখ্‌লেই আমি সুখী হবো!'

তাহার একখানি হাত যে কখন আমার মুঠার মধ্যে লইয়াছিলাম, মনে নাই। ধীরে ধীরে সেখানি ছাড়িয়া দিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম।

তাহাকে কি একটা জবাব দিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মনে হইল—কে যেন সবলে আমার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে!

জলভারে দুইজনের চক্ষুই চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিল।...

বিরাট্‌ বাষ্পীয়যান তখন আপন বেগেই 'হুস্‌' 'হুস্‌' শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

—শেষ-

এই উপন্যাসখানি ‘যবনিকা’ নামে ‘পঞ্চপুষ্পে’ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্থানে স্থানে বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ইহার নূতন নামকরণ করিলাম—নারীর রূপ।